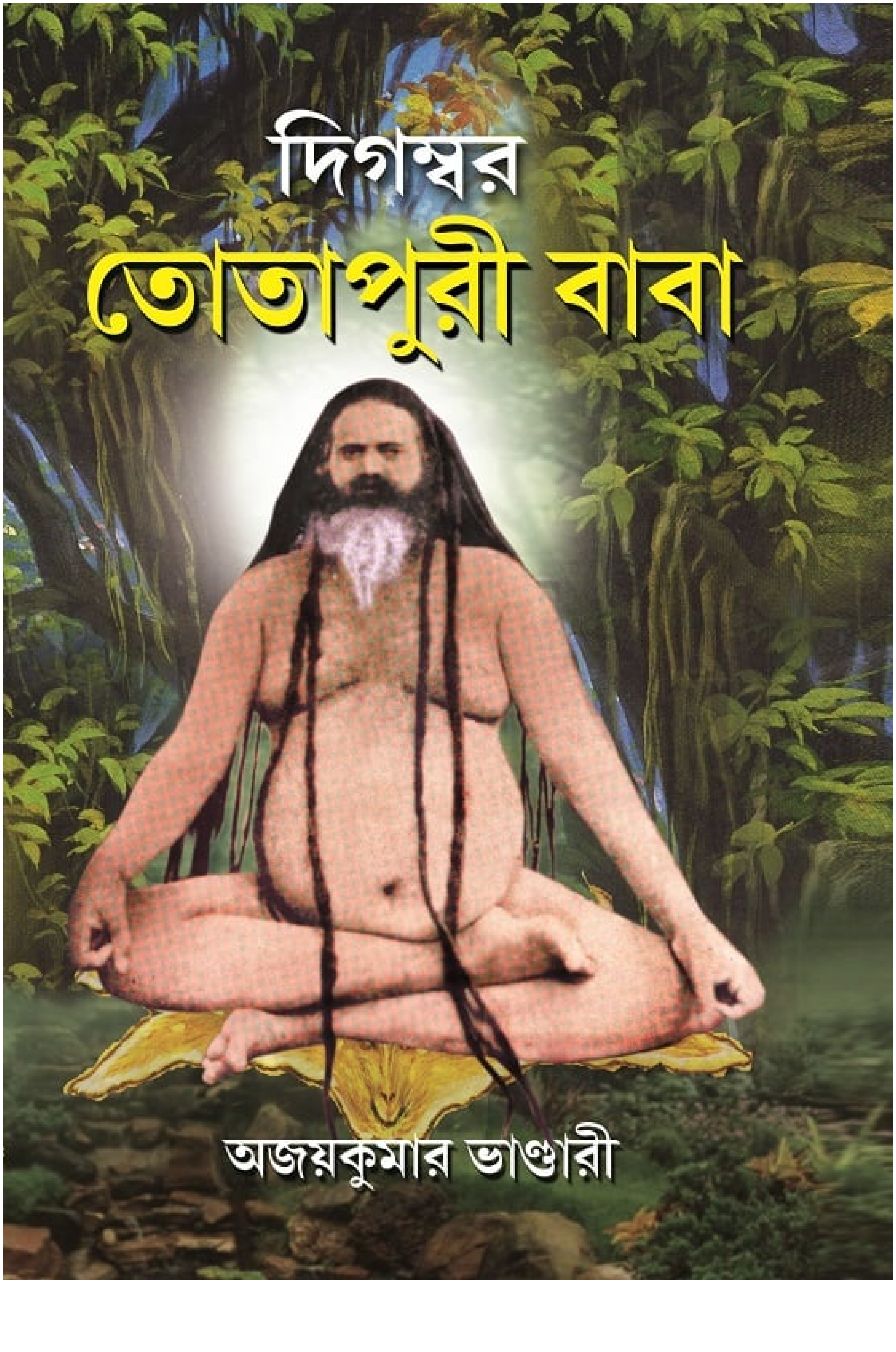
দিগম্বর
তোতাপুরী বাবা



অজয়কুমার ভাণ্ডারী


দিগম্বর
তোতাপুরী বাবা
অজয়কুমার ভাণ্ডারী

দিগম্বর তোতাপুরী বাবা

(দিব্য জীবন ও লীলা কাহিনী)

অজয়কুমার ভাণ্ডারী

২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪২১
আগস্ট, ২০১৪

প্রকাশক
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোনঃ : ২২৪১-৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮
Website : www.girijalibrary.com
Email : info@girijalibrary.com

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

বর্ণ সংস্থাপন
শ্রীপ্রদ্যুৎ সাহা
৭, কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

মুদ্রণ
এস অ্যান্ড এস প্রিন্ট সার্ভিস
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ দুর্গাপ্রসন্ন পরহংসদেবের
রাতুল চরণ যুগলে নিবেদন করলাম।

নিবেদন

বছরখানেক আগে গিরিজা লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে তোতাপুরী মহারাজের একখানি জীবনীগ্রন্থ লিখতে অনুরোধ জানান। তখন থেকেই তোতাপুরী বাবার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। কিন্তু প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হলাম তা হল তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে। তোতাপুরী বাবার বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর জন্মস্থান, সময়, পিতামাতা, বাল্যাবস্থা, সন্ন্যাসলাভ বিষয়ে কোনো লিখিত তথ্য নেই। প্রায় তিনশত বছর ব্যাপী তাঁর মহাজীবন কাল। অথচ তাঁর জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় না। দু'একখানি পুস্তিকা ও প্রবন্ধে তোতাপুরী বাবার কথা লেখা হলেও পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে যে সব বইপত্রে বা পত্রিকায় তোতাপুরী নাঙ্গা বাবার কথা লেখা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করেছি। আর মনে মনে তোতাপুরী বাবাকে স্মরণ করেছি। কারণ আমি বেশ জানি নিগমপন্থী ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরী বাবার কৃপা না হলে তাঁর কথা লেখা সম্ভব নয়। এরপর হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলাম দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলায় চলে গেছি। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তোতাপুরী মহারাজ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুখোমুখি বসে আলাপ করছেন। তখন আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। আমার এই স্বপ্ন দর্শনের কথা শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবুকে বললাম। তিনি বললেন, তাহলে বেশ বোঝা গেল আমরা ঠিক পথেই হাঁটছি। অজয়বাবু আপনি কাজ চালিয়ে যান, বাবার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই সফল হবেন।

যাই হোক, সাহস বাড়ল। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করলাম। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও অন্যান্য বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলি মোটামুটি পড়ে ফেললাম। এবার পুরী গির্ণারীবন্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রকাশিত কিছু পুস্তিকা হাতে পেলাম। তথ্য সংগ্রহের কাজে কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর বেশ দ্রুতগতিতে লেখা শুরু হল। মনে হল আমার গুরুমহারাজ এবং তোতাপুরী বাবার আশীর্বাদেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনই আত্মজ্ঞানী তোতাপুরী বাবার জীবন ও দর্শন। বলা যায়, অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যার প্রকট বিগ্রহ তিনি। এই বইতে তাঁর লোকোত্তর মহাজীবনের ভাবধারা যেমন অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে তেমনি তাঁর লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন কর্মধারা তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা না বললে নিজেকে দোষী মনে হবে। রিষড়া বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষক ইউ. পি. তিওয়ারী এবং উক্ত বিদ্যালয়ের অপর কর্মচারী শ্রীকালিকাপ্রসাদ রিষড়ায় তোতাপুরী বাবার অবস্থানকালের অনেক তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। পুরী গির্ণারীবন্ত আশ্রমের শ্রীযুক্ত শ্রীধর দাস অনেক তথ্য দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এছাড়া বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থের যথাস্থানে সে সকল প্রতিষ্ঠান ও লেখকদের ঋণ স্বীকার করা হয়েছে।

তথ্যচয়ন ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন সুবিখ্যাত লেখক ও সাধক পিতৃস্থানীয় নিগূঢ়ানন্দ ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে। তাঁদের জন্য গুরুদেবের চরণে মঙ্গল কামনা করি।

পরিশেষে, যাঁর উদ্যোগ ও উৎসাহ ছাড়া এই বই প্রকাশিত হত না সেই প্রশান্ত চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সুধী পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

অজয়কুমার ভাণ্ডারী।

এক

সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্বতীর্থ ফলপ্রদ।।

অর্থাৎ সাগরের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণভাগে যে প্রদেশ আছে তা সর্বতীর্থফলপ্রদ। পুণ্যলোভীগণ এই প্রদেশে বাস করেন। এভাবেই উৎকল খণ্ডে শ্রীক্ষেত্র পুরীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নগর আছে। তার মধ্যে বদ্রীনাথ এবং দ্বারকা বৈষ্ণবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। রামেশ্বরম প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ হিসাবে। কিন্তু পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুণ্যস্থলী সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মহামিলন ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। পুরীতে সকল ধর্মের প্রবক্তা ও সাধকগণ শ্রীজগন্নাথদেবকেই আদিদেব রূপে মেনে নিয়েছেন। ফলে এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক দলমতের সৃষ্টি হতে পারেনি। বলা যায় শ্রীক্ষেত্র পুরী সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তাবহ রূপে বিরাজিত আছেন।

ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ শ্রীমদ দিগম্বর তোতাপুরী মহারাজ এই নীলাচলের অদূরে মহাজীবনের অন্তিম পর্বে প্রায় পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম গির্ণারীবন্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে লোকনাথ শিবমন্দিরের কাছেই অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম। গির্ণারীবন্ত এক বালিয়ারী ঢিবি। লোকালয় থেকে দূরে গাছপালা জঙ্গলে পূর্ণ এক শান্তিময় স্থান। শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত নির্জন। ব্রহ্মচিন্তনের আদর্শ পরিবেশ। মৌমাছির গুঞ্জন আর দূর থেকে ভেসে আসা সাগরের গর্জন ভিন্ন বিশেষ শব্দ কানে আসে না।

শান্তিপ্রিয় অদ্বৈত বেদান্তবাদী তোতাপুরী বাবা ব্রহ্মচিন্তার জন্য নির্জনে এখানেই আসন পেতেছিলেন।

স্থানীয় লোকেরা গির্ণারীবন্ত বালির ঢিবিকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। কথিত আছে পৌরাণিক যুগের এক ঐতিহ্যময় স্মৃতি বহন করে চলেছে এই ছোট বালির পাহাড়টি। পুরীর মহারাজ ইন্দ্রদুন্ম্য দৈবাদেশে বালুকাস্তূপ খনন করে নীলমাধব নীলাচলনাথকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে কিছুটা বালি গির্ণারীবন্তে জমা হয়। সুতরাং নীলমাধবের স্পর্শ থাকায় স্থানটি সকলের কাছে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। সম্ভবত সেই কারণেই আত্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবা এখানে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বালিয়ারী ঢিবির গির্ণারীবন্ত নামকরণের একটা কারণ পাওয়া যায়। পরিব্রাজক তোতাপুরী বাবা গুজরাটের জুনাগড় অঞ্চলের গির্ণার পর্বত পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন। গির্ণার পর্বতের স্মৃতি হিসাবেই পুরীতে এই অঞ্চলের গির্ণারীবন্ত নামকরণ হয়েছে বলে অনেক ভক্ত মনে করেন।

দুই

শ্রীশ্রীতোতাপুরী মহারাজ বা দিগম্বর বাবা হলেন আচার্য শঙ্করের দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভুক্ত অদ্বৈত বেদান্তী সন্ন্যাসী। তাঁর মতে বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে বেদান্ত সাধনার পথই উৎকৃষ্ট পথ। এই পথে মানুষ আত্মতত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তিলাভ করতে পারে। তবে অনুশীলন ও যত্ন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য প্রয়োজন শ্রুতি বাক্যের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। তাই এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী পরমপুরুষ তোতাপুরী বাবার মহাজীবন ও কর্মধারা আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করা যাক। দিগম্বর তোতাপুরী বাবাকে জানতে হলে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

অদ্বৈতবাদ দর্শন হিন্দু দর্শনের একটা অঙ্গ। অদ্বৈত ভাবনা অতি প্রাচীন। বেদান্ত কথার অর্থ হল শেষ ও তত্ব। অদ্বৈত ভাবনা বেদভিত্তিক ও বেদের অংশ। উপনিষদই হল বেদান্ত দর্শন। বেদের দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে রয়েছে তত্ব। আর তত্বের ভাবনা রয়েছ উপনিষদে। তাই উপনিষদকেই বেদান্ত আখ্যা দেওয়া হয়।

সুতরাং বেদ বাদ দিয়ে বেদান্ত নয়। বলা যায়, বেদান্ত হল বেদ মন্থনের নির্য্যাস। ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মচৈতন্য লাভ করাই বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য। যে মতে, জগতের মূল তত্ব যে ব্রহ্ম তা নির্ণয় করা হয়, তাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই মতে জ্ঞানেই মুক্তিলাভ সম্ভব। অদ্বৈত মতের অন্য নাম শঙ্কর মত। জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হলেই মুক্তিলাভ হয়। মুক্তিতে আর জগৎ থাকে না। জগৎ মিথ্যা কিন্তু অসৎ নয়।

আত্মাকে আশ্রয় করে যে বিদ্যা তাকে এক কথায় বলে অধ্যাত্ম বিদ্যা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্জনে যত্নবান হওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব খুব সহজ করে বলেছেন—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। তাই ঈশ্বর ভাবনা জীবের সহজাত। ভগবৎচিন্তা, ধ্যান-ধারণা, উপাসনা, সাধনা, তপস্যা—সকল বিষয়ের মূল কথাই হল আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভই চৈতন্য লাভ, আত্মদর্শনই ব্রহ্মদর্শন। আত্মচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্য। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, তোমাদের চৈতন্য হোক।

আত্মাকে জানতে পারলে মানুষ আত্মবিদ্ হতে পারেন। আর আত্মবিদ্ই ব্রহ্মবিদ্। তখন তিনি বলতে পারেন 'হংসোহম' 'ব্রহ্মোস্মি' অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। তিনি ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে গিয়েছেন। এই ভাবে জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে। তখন আর তার অন্য অনুভব হয় না।

সংস্কৃত 'অদ্বৈত' কথার অর্থ হল ন দ্বৈত—অদ্বৈত। অর্থাৎ যেখানে আর দ্বৈতভাব থাকে না, তাই অদ্বৈত। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই—সেই ভাব। অন্য কথায় নুনের পুতুল সাগরে গিয়ে পড়লে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই এক চরম তুরীয় অবস্থা। যেখানে কোনো ভেদবুদ্ধি নেই, তাই অদ্বৈত। অদ্বৈত কোনো একটা সংখ্যামাত্র নয়। অদ্বৈত একটা অনুভূতিমাত্র।

বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ধর্মীয় ভাবনাকে কেন্দ্র করে অদ্বৈত ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সকল সাধনার ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে অদ্বৈত দর্শনে। বলা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মিলন ঘটেছে অদ্বৈত দর্শনে।

অদ্বৈত দর্শন অতি প্রাচীন। অদ্বৈতদর্শন এক সর্বোচ্চ দর্শন। ব্রহ্মচেতনা অতি সূক্ষ্ম পবিত্র চেতনা। জ্ঞানানুশীলন ভিন্ন এই চেতনার বিকাশ ঘটে না। এ এক অপূর্ব মুক্তি ভাবনা। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। গুরুভিন্ন এই চেতনা উপলব্ধ হয় না। ব্রহ্মবিদ গুরুর আশ্রয়ে তাঁর শরণাগতি নিয়ে গভীর জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা এই চেতনার উপলব্ধি ঘটতে পারে।

অদ্বৈত বেদান্তী আত্মার একত্ববাদকে সমর্থন করেন। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে দ্বিতীয় আত্মার নাস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। এক সদবস্তুই বিদ্যমান। নিখিল বিশ্ব এক আত্মার সত্তায় সত্তাবান, এক আত্মসূত্রে গ্রথিত। দ্বিতীয় বস্তু মায়াপ্রভাবে প্রতীতি হয়, তার বাস্তব সত্তা কিছু নেই। জীব ও জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই মায়িক বিস্তার। জীব অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড অভিব্যক্তি। জীব যদি ঘটাকাশ হয়,তবে ব্রহ্ম মহাকাশ। এক সহস্র ঘট এক জায়গায় থাকলে সহস্র ঘটাকাশ জন্মায়, একটা ঘট ভেঙে গেলে সেই ঘটাকাশ মহাকাশে মিলে যায়, অন্য ঘটাকাশ অবিকৃত থাকে। ঘট হল আকাশের উপাধি। জীবের অন্তঃকরণ তেমনি এক অদ্বিতীয় ভূমা ব্রহ্মের উপাধি। একটা ঘটাকাশ যেমন ভেঙে ধূলায় মিশে গেলে সব ঘটাকাশ ধূলামলিন হয় না, সেই রকম এক জীবে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, কর্মপ্রবৃত্তির জন্ম মৃত্যু হলে অন্য জীবে তা সঞ্চারিত হয় না। জীব শুধুমাত্র দেহ, শুধুমাত্র অন্তঃকরণ বা শুধুমাত্র আত্মা নয়। আত্মা, দেহ, অন্তঃকরণ পরস্পরের অধ্যাসের ফলে জীবত্বের সৃষ্টি। দেহ, অন্তঃকরণ প্রভৃতির ধর্ম আত্মায় আরোপিত হয়। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি অজর অমর আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে না। এগুলি হল জীবের ধর্ম। এই ধর্ম ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়। অনাদি অবিদ্যা এবং নিত্য অদ্বিতীয় আত্মার সম্বন্ধবশতঃ আত্মায় অনাদি জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতি বিভাবের বিকাশ হয়।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে আত্মা নির্গুণ ও নির্বিশেষ তত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঈশ্বর জীব ও জগৎ প্রভৃতির বিভাব অবিদ্যা কল্পিত ও মিথ্যা। জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। জীব ও পরম শিবের কোনো ভেদ নেই। 'তত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বৈদিক মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মের মায়া আবরণ সৃষ্টি করে জীবের ব্রহ্মভাবকে ঢেকে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হলে, জীবের বিজ্ঞান দৃষ্টি খুলে যায়। তখন সে নিজের ব্রহ্মভাবকে প্রত্যক্ষ করে এবং চিদানন্দরূপ : শিবোহম—এই শিবরূপে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল অদ্বৈতবাদের মূল কথা।

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন আচার্য শঙ্কর। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত মত বা অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই শঙ্করের আবির্ভাব। অবশ্য বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। বেদান্তে নির্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় ব্রহ্মের কথাই থাকে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর জোর দিয়েছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ওপর।

অদ্বৈতবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আচার্য শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈতবাদের চিন্তাভাবনা ছিল। তবে শঙ্করাচার্য তাঁর পূর্বসূরীগণের অদ্বৈতবাদের ধ্যান-ধারণার একটা সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত জ্ঞানেই সকল সাধনার পরিসমাপ্তি। আর অদ্বৈত বুদ্ধিতে সকল মতবিরোধের সমাধান হয়।

তিন

অদ্বৈত বেদান্ত সন্ন্যাসীগণের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী বাবা বা দিগম্বর বাবা হলেন অন্যতম। জানা যায় তৈলঙ্গ স্বামীর মতো তিনিও প্রায় ৩০০ বছর কাল স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন। নামের প্রথমাংশ তোতা এবং দ্বিতীয় অংশ পুরী। সম্ভবত তিনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তোতাপুরী বাবা এমন একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী যিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনো আত্মকথা প্রকাশ করতেন না। কেউ কৌতূহলী হয়ে তাঁর জীবন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন সন্ন্যাসীর কোনো পূর্ব পরিচয় থাকে না। তিনি ছিলেন মহান পরিব্রাজক। তিনি যখন যেখানে যেতেন ভক্তগণ তখন তাঁকে নিজেদের পছন্দমতো নামে সম্বোধন করতেন। সেই কারণেই তিনি তোতাপুরী বাবা, নাঙ্গা বাবা, দিগম্বর বাবা, লেংটা বাবা, নাগা বাবা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হতেন। কেউ কেউ তাঁকে কাংকারিয়া বাবা আবার, কেউ বা মৌনী বাবা বলেও সম্বোধন করতেন।

ব্রহ্মচারী তোতাপুরী বাবার জীবনকথা বিশেষ জানা যায় না। তাঁর পূর্বাশ্রমের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর আবির্ভাবের সময়-দিন-তিথি কিছুই জানা যায় না। তাঁর মাতা-পিতার বিষয়ে কোনো লিখিত বিবরণ নেই। সম্ভবত মুঘল যুগে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনো পাঞ্জাবী সুবায় তিনি আবির্ভূত হন। যতদূর জানা যায়, বালুচিস্তান প্রদেশে হিংলাজ অঞ্চল হল বাবার জন্মস্থান। বর্তমানে বালুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্গত।

শৈশবকালে তোতাপুরী বাবা বালব্রহ্মচারী রূপে গৃহত্যাগ করেন এবং নাগা সম্প্রদায়ের কোনো গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। হিংলাজে 'বাবা লাদন' নামে একটা মঠ আছে। বাবা রাজপুরীজী সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের বর্তমান মোহন্ত হিংলাজ অঞ্চলকেই তোতাপুরী বাবার আবির্ভাবস্থল বলে সনাক্ত করেন। মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবা রাজপুরীজী ছিলেন তোতাপুরী বাবার শিষ্য। এখনও গুরুপরম্পরা ক্রমে মঠের মোহন্তগণ সকল কার্য সম্পাদন করে থাকেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে তোতাপুরী পাঞ্জাবের নাগামঠের প্রধান মোহন্ত ছিলেন। কয়েক দশক যাবৎ তিনি মঠের কাজকর্ম দেখাশোনা করেছেন। তখন মঠে প্রায় সাতশো নাগা সন্ন্যাসী থাকতেন। তারপর তিনি পরিব্রাজক রূপে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

তোতাপুরী বাবা, ভারতের আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করেছেন এবং সীমান্তবর্তী বহু দেশেও গমন করেছেন। জানা যায় তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে গিয়েছিলেন। এশিয়া মাইনর ও হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। ক্যাসপিয়ান সাগর ও সুদূর মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত তিনি গমন করেছিলেন। সেখান থেকে তিব্বত হয়ে উত্তর ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ এশিয়া, মালয়েশিয়া ঘুরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। হিন্দুস্থানের প্রতিটি কোণে তিনি পর্যটন করেছেন। কোনো কোনো স্থানে গিয়েছেন একাধিকবার। তিব্বত, মানস সরোবর, কাশ্মীর উপত্যকা, অনন্তনাগ, উত্তরকাশী, নেপালের তরাই অঞ্চল, বরাহক্ষেত্র, নিম্নদেশে দার্জিলিং, সিকিম, পূর্বে কামাখ্যা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছেন কয়েক দশক ধরে। আবার কখনো ঘুরেছেন গাঙ্গেয় অববাহিকায়, নর্মদা, কাবেরী নদীতটে। বছরের পর বছর কাটিয়েছেন হরিদ্বার, মীরাট, কাশী, ফৈজাবাদ, ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে। গুজরাটের মৈনাক-গির্ণার পার্বত্যপ্রদেশ, অমরকন্টক, চিত্রকূট, শ্রীশৈলম, অরুণাচল পর্বত পরিভ্রমণ করেছেন। গঙ্গাসাগর, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, পুরী প্রভৃতি স্থানে গমন করেছেন একাধিকবার। এমনি করে প্রায় একশো বছর কাল তোতাপুরী বাবার মহাপরিব্রাজনে অতিবাহিত হয়েছে।

তাঁর প্রিয় সাধনভূমি নর্মদা। নর্মদা শুধু তপোভূমি নয়, দেবভূমি। সেই পৌরাণিক কাল থেকে নর্মদার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়ে আসছে। রুদ্রদেহের স্বেদবিন্দু থেকে সৃষ্ট নর্মদা সপ্ত কল্প কাল ব্যাপী বিরাজিত। বহু সাধু-মহাত্মার সাধনস্থলী নর্মদা। নর্মদা সিদ্ধিদাত্রী, মহাপাতকনাশিনী, মোক্ষদায়িনী। এর উত্তর কূলে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং দক্ষিণ কূলে পিতৃগণের আবাস। শুদ্ধমনে শুধুমাত্র নর্মদাকে দর্শন করে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। নর্মদা তীরে ওঁকারনাথ পাহাড়ে আচার্য শঙ্করের দীক্ষা হয়। পবিত্র নর্মদাতীর্থ অদ্বৈত সন্ন্যাসী তোতাপুরী বাবার সাধনক্ষেত্র। তিনি এই নর্মদার কূলে চল্লিশ বছর যাবৎ তপস্যা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছেন। যোগজীবনে তিনি প্রায় যোগের সকল মার্গেই সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রায় শতবৎসর কাল ব্যাপী চলেছে তাঁর সাধনা ও তপস্যা। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোনো পরম্পরাকেই বাদ দেননি তিনি। সকল মত ও পথের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন। অবশেষে তিনি আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতজ্ঞান নিষ্ঠার ধারাকে অবলম্বন করেছিলেন। দক্ষিণ বিহারে ঝাড়খণ্ডে ছিন্নমস্তার মন্দিরে তিনি অন্যদেহে প্রবেশের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

সাধুসঙ্গ তোতাপুরী বাবার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাশীর সচল শিব তৈলঙ্গ স্বামী, নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ, মহাবতার বাবাজী, হরিহর বাবা, জটিবাবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাঙালি বাবা, হাড়িয়াখান বাবা, সীতারামদাস ওঁকারনাথ, বামাক্ষেপা, নিগমানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস,. স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, স্বামী যোগানন্দ, যুক্তেশ্বরজী, রমণ মহর্ষি প্রমুখ মহাত্মাগণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শোনা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিহর বাবা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস এবং আরও অনেকে তাঁর কাছে বেদান্ত দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মহাজীবনের অন্তিমপর্বে তোতাপুরী বাবা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর শ্রীক্ষেত্র পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। সমুদ্রতটে নির্জন জঙ্গলময় গির্ণারীবন্তে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে অসংখ্য তাপিত মানুষকে অকৃপণ অনুগ্রহ দান করে ধন্য করেছেন। অবশেষে ১৯৬১ সালের ২৮শে আগষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমার সকাল বেলায় মহাজ্ঞানী তোতাপুরী বাবা মহাসমাধিলাভ করেন।

কিছু ব্যক্তি হরিয়ানা প্রদেশে নাগামঠে তোতাপুরী বাবার মহাসমাধি হয়েছে বলে দাবী করেন। কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। নাগামঠে যে তোতাপুরীজীর মহাসমাধি সংরক্ষিত আছে তা সম্ভবত অন্য কোনো ওই একই নামের সন্ন্যাসী বা অন্য কোনো নাগাসন্ন্যাসীর হয়ে থাকবে।

দিগম্বর তোতাপুরী মহারাজকে ভক্তগণ নানা নামে অভিহিত করতেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে যে, যে নামেই তাঁকে আখ্যাত করুন না কেন, পুরীধামে তিনি দিগম্বর পরমহংস বাবা নামেই পরিচিত ছিলেন। তবে একটা বিষয় অনুধাবন যোগ্য যে তোতাপুরী বাবার এক বিগ্রহই সর্বত্র সকল মঠ ও আশ্রমে

বিরাজিত আছেন। পুরী গির্ণারবন্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে তোতাপুরী বাবার যে মূর্তিতে সেবা পূজা হয়, সেই একই বিগ্রহ হিংলাজের বাবা লাদন মঠ, আনন্দপুরী মঠ, বাবা রাজপুরীজী মঠ (কাইথাল) এবং রামকৃষ্ণ মিশনে পূজিত হয়ে থাকেন।

বর্তমান গ্রন্থে তোতাপুরী বাবার যে বিগ্রহ দেওয়া হল, সেই বিগ্রহ সম্ভবত উনবিংশ শতকের শেষপর্বে অথবা বিংশ শতকের প্রথম দশকে তোলা হয়েছে। অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ বাবাকে শ্রীশ্রী যোগেশ্বর ব্রহ্মবিদ দিগম্বর পরমহংসদেব অথবা সংক্ষেপে দিগম্বর বাবা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

চার

মধ্যভারতে সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করে ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী পূর্বভারতে আসেন। বহুতীর্থ, পুণ্যস্থলীতে যদৃচ্ছ পরিব্রাজন করতে থাকেন। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে তিনি কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীবাড়ীতে আসেন। তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি ব্যুত্থিত পুরুষ। পরমব্রহ্মে সর্বদা রমণ করেন। নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ হওয়া সত্বেও ব্রহ্মজ্ঞ তোতা পর্যটনে বার হয়েছিলেন। কারণ যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন তিনি জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেও সেই পরম সত্তাকেই দর্শন ও উপলব্ধি করেন। সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্যটাই হল ব্রহ্মকে জানা ও সাক্ষাৎ করা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই সন্ন্যাস জীবনের পরম পরিণতি। জ্ঞান দ্বারাই সেই পরম তত্ব জানা যায়। ঋগবেদের মহামন্ত্র হল—প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন যিনি অর্থাৎ যাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে আত্ম অনুভূতি আছে তিনিই যথার্থ ব্রহ্মবিদ গুরু। সর্বকারণ জ্ঞানস্বরূপ, একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন এমন জ্ঞানকে বলে পরোক্ষ জ্ঞান। আর আমিই সেই নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আনন্দময় পরম ব্রহ্ম এই অনুভূতিকেই বলে অপরোক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রজ্ঞাবান শ্রীমদ পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী সেই ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ তত্বজ্ঞ গুরু। ভূভারত পরিব্রাজনের মধ্যে দিয়ে তিনি শঙ্করাচার্যের উপলব্ধ পরম প্রজ্ঞাবাণীকেই বেদান্তবিদ গুরুরূপে জগতে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্মরণীয় সেই শঙ্করের প্রজ্ঞাবাণী—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।

কোটি কোটি শাস্ত্রগ্রন্থের যা প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা, সেই কথাই অর্ধমাত্র শ্লোকে বলা যেতে পারে এই ভাবে যে ব্রহ্মই কেবল সকল আর জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, এবং জীব স্বয়ং ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ শিষ্য অর্জুনকে সেই কথাই বলেছিলেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। (গীতা ৭।৭)

বস্তুত তিনি (ব্রহ্ম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। সুতোয় যেমন মণিসকল গাঁথা তেমনি তাঁতেই বিশ্বজগৎ বিরাজিত আছে।

বেদান্তবাদী গুরু তোতাপুরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠিক করেছিলেন তিনদিন কালীবাড়ীতে থেকে ফিরে যাবেন উত্তর- পশ্চিম ভারতে। কিন্তু ব্রহ্মময়ী জগদম্বা কি কারণে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন তখন তাঁর তা জানা ছিল না।

চাঁদনী ঘাটে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসে বসে আপন মনে মায়ের নাম করছেন। এমন সময় দীর্ঘবপু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী তাঁকে দেখেই অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করলেন। বেদান্ত বিদ্যা শিক্ষার এমন উত্তম অধিকারী এই বিরল ব্যক্তি কে? খুব ভালো করে তিনি ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন এই পুরুষ কখনো সাধারণ মানুষ হতে পারেন না। তিনি এগিয়ে এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে বেদান্তবিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে বেদান্ত সাধন করবে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ জটামণ্ডিত শ্মশ্রুগুম্ভধারী দিগম্বর বিরাট দেহী সাধুকে দেখে বললেন—আমি মায়ের সন্তান। আমি নিজে কিছুই জানি না। আমার মা-ই সব জানে। আগে তাকে জিজ্ঞেস করে আসি!

—যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এস। আমি কিন্তু দীর্ঘকাল এখানে থাকব না।

ঠাকুর ধীরে ধীরে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে গেলেন, বললেন, মা গো এক লেংটা সাধু আমায় বেদান্ত শিক্ষে দিতে চায়, কি করব বলে দাও?

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে শুনতে পেলেন—যাও, বেদান্ত শিক্ষা করো। তোমাকে শেখাবার জন্যই তাঁর এখানে আগমন ঘটেছে।

ফিরে এসে তিনি তোতাপুরীকে মায়ের অনুমতির কথা বললেন এবং তোতাপুরীকে বৈদান্তী গুরুরূপে বরণ করলেন।

মন্দিরের মধ্যে দেবী মূর্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা রূপে সম্বোধন করে অনুমতি নিয়েছেন শুনে তোতার মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি ভাবলেন রামকৃষ্ণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পাষাণ মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। মূর্তির মধ্যে কখনো ভগবৎশক্তির বিকাশ হতে পারে না বলেই বেদান্তী তোতা দৃঢ় মত পোষণ করতেন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। একমাত্র বেদান্ত বিজ্ঞানের অনুধ্যানেই সেই সত্য অনুভূত হয়। সেখানে মূর্তি (পুতুল) পূজার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তোতা নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি নির্গুণ পরমাত্মার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। অন্য কোনো দেবীর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা তাঁর কল্পনায় আসতে পারে না। তাঁর ধারণা ছিল মানুষ পুরুষাকার অবলম্বন করে পরমজ্ঞান যা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে জানতে পারে। মূর্তি পূজা বা উপাসনা একমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত পথিকেরাই করে থাকে।

যাই হোক তোতপুরী ভাবলেন, বেদান্তজ্ঞান হলেই প্রকৃত জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানের সকল অন্ধকার কুসংস্কার আপনি বিদূরিত হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি তখন আর কিছু না বলে ঠাকুরকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ প্রদানে যত্নবান হলেন।

বেদান্তী গুরুর দীক্ষা নিতে হলে আগেই ঠাকুরকে শিখাসূত্র ত্যাগ করতে হবে এবং শাস্ত্রবিধানানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্মত হলেন। কিন্তু জানালেন, তিনি সন্ন্যাস নেবেন গোপনে যাতে তাঁর বৃদ্ধা মাতা কোনোক্রমে ব্যথা না পান। তোতাপুরী ঠাকুরের কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন 'বেশ তাই হবে'। এরপর তিনি পঞ্চবটীতে সাধনের আসন পাতলেন।

নির্দিষ্ট দিনে তোতাপুরী ঠাকুরকে দিয়ে পিতৃপুরুষদের শান্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম করালেন এবং শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করালেন। ঠাকুর তোতাপুরীকে বেদান্ত গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সুতরাং তাঁর সকল আদেশ পালন করলেন। পঞ্চবটীতে আসন পেতে দীক্ষালাভের জন্য অপেক্ষায় রইলেন।

শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে গুরু-শিষ্য পঞ্চবটীর কুটিরে বসলেন। হোম যজ্ঞ শুরু হল। সনাতন গুরুপরম্পরাগত ধারায় মন্ত্রোচ্চারণ করে তোতাপুরী হোম করতে লাগলেন। ঠাকুরও তোতাপুরীর কথার অনুসরণ করে অগ্নিতে আহূতি দিতে লাগলেন। প্রথমে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করলেন। তারপর শুরু হল বিরজা হোম—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম রূপে আমাতে অবস্থিত পঞ্চভূত সকল পবিত্র হোক। আহূতি প্রদান দ্বারা আমি যেন রজোগুণপ্রসূত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতি: স্বরূপে উন্নীত হই—ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পাঠ হল।

বহুক্ষণ ধরে হোমাগ্নিতে আহূতি দিয়ে বলা হল— ভূরাদি লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলাম এবং আমি জগতের সর্বজীবকে অভয়দান করছি বলে সংকল্প উচ্চারণ করানো হল। অবশেষে বিরজা সুসম্পন্ন হল। তারপর শিখাসূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথারীতি আহূতি দেওয়া হল। ঠাকুরকে কৌপিন ও কাষায় প্রদান করা হল। এবার ঠাকুর গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করতে বসলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা অনেকে বলেন, শ্রীমৎ তোতাপুরী দীক্ষাপ্রদান করে ঠাকুরকে 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করেছিলেন। আবার, অনেকে অবশ্য বলেন রামকৃষ্ণ নামটি শ্রীযুক্ত মথুরামোহনই প্রথম সম্বোধন

করেছিলেন। তবে তোতাপুরী প্রদত্ত নামকরণই সমীচীন বলে মনে হয়।

বেদান্তবিদ তোতাপুরী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বেদান্ত প্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায় শিক্ষা দিতে লাগলেন—

''নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজ প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনো বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনো নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ়পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি সহায়ে তাহাতে অবস্থান কর; দেখিবে নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে।'' (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ২য়, স্বামী সারদানন্দ)

তোতা আরও জানালেন যে, যে জ্ঞান দিয়ে একজন অন্যজনকে দেখে তা ক্ষুদ্র তুচ্ছ সীমিত, তাতে পরমাননন্দ লাভ হয় না। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা একজন অন্যজনকে দেখে না, জানে না, অন্যের বাক্য শ্রবণ করে না—তাকে 'ভূমা' বলে। সেই জ্ঞান অর্জিত হলে ভূমানন্দ বা পরমানন্দ লাভ হয়।

এইভাবে তোতাপুরী নানা সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা ঠাকুরকে সমাহিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠাকুরের আজন্ম লালিত সংস্কার তাঁকে নামরূপাত্মক জগৎকে ভুলিয়ে দিয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হতে দিচ্ছিল না। তিনি ধ্যান করতে বসেও অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই নামরূপের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারছিলেন না। আর সকল বিষয়ের ওপর থেকে ঠাকুর মনকে তুলে আনলেও তিনি শ্রীজগদম্বার চিদঘন উজ্জ্বল বিগ্রহখানি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। বেদান্ত সিদ্ধান্ত বাক্যের উপদেশাবলী পর্যুযপরি তিনদিন ধরে শুনেও ঠাকুর কিছুতেই সমাধিমগ্ন হতে পারলেন না। তখন নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন না হতে পেরে ঠাকুর চোখ খুলে তোতাপুরীকে সে কথা জানালেন। তখন তোতা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে রাগত স্বরে বললেন, 'কেঁউ নেহি হোগা, অবশ্যই হবে।' বলেই চারদিকে তাকিয়ে কুটিরে মধ্যে এক টুকরো কাঁচ ভাঙা পেলেন। তাড়াতাড়ি সেটাকে শক্ত করে ধরে ঠাকুরের দুই ভ্রুযুগলের মধ্যিখানে জোরে বিদ্ধ করলেন। দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললেন, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আন।'

এবার ঠাকুর কঠিন সংকল্প করে ধ্যানে বসলেন। পূর্বের মতো শ্রী জগদম্বার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ঠাকুর জ্ঞান অসি দ্বারা সেই মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। অমনি মন নামরূপাত্মক জগৎ থেকে হু হু করে উঠে গেল। ঠাকুর গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন।

ঠাকুরের সমাধি গভীর হয়েছে কিনা জানার জন্য তোতাপুরী দীর্ঘক্ষণ তাঁর সামনে বসে রইলেন। তারপর কুটিরের বাইরে এসে দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিলেন পাছে কেউ এসে ঠাকুরের সমাধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোতা ধীরে ধীরে গিয়ে পঞ্চবটীতলায় নিজের আসনে বসলেন। ঠাকুর কখন দরজা খোলার জন্য আবেদন করবেন সেই অপেক্ষায় রইলেন।

কিন্তু দিন গেল, রাত এল। এই একভাবে তিন তিনটি দিন কেটে গেল। ঠাকুর সমাধিমগ্ন অবস্থায় কুটিরে আসনে বসে রইলেন। দ্বার খুলে দেবার জন্য আবেদন করলেন না। তখন তোতা নিজেই বিস্মিত হলেন। আসন ত্যাগ করে উঠে গিয়ে নিজেই তালা খুলে ফেললেন। কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন ঠাকুর এক ভাবে আসনে বসে আছেন। সমাধিমগ্ন। দেহে কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। প্রশান্ত মুখ গম্ভীর দর্শন, তেজপূর্ণ কান্তিমান। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা বুঝতে পারলেন ঠাকুর সত্য সত্যই বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধিদশা।

এবার তাতাপুরীর অবাক হবার পালা। ভাবলেন তিনি নিজে এই অবস্থায় উপনীত হবার জন্য সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল কী কঠিন তপস্যা করেছেন। অবশেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন। আর এই বাঙালী যোগী মাত্র তিন দিনেই সেই কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন! ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী তোতার তবুও সংশয় ঘুচল না। তিনি

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিষ্যকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রকৃত সমাধিযোগের লক্ষণ প্রকাশ হয়েছে কি না অনুসন্ধান করতে লাগলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন ঠাকুরের হৃদস্পন্দন হচ্ছে কি না। নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না তাও পরীক্ষা করতে ছাড়লেন না। শুকনো কাষ্ঠখণ্ডের মতো স্থির ভাবে আসনে বসে থাকা ঠাকুরের দেহটিকে বার কয়েক স্পর্শ করলেন। কিন্তু তাতে ঠাকুরের কিছুমাত্র অনুভূতি হল না। তিনি নিশ্চল-নিবাত-প্রদীপ শিখার মতো মনকে পরমব্রহ্মে লীন করে সমাহিত হয়ে আছেন।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মণঃ।। গীতা ৬।১৯

প্রদীপ শিখা যেমন বায়ুহীন স্থানে স্থির অচঞ্চল থাকে, সেই ভাবে মনকে সংযত করে যদি যোগী যোগযুক্ত হয়, তাকে স্থির প্রদীপ শিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই অবস্থায় যোগী সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয় সংযোগ ছাড়াই তখন গভীর সুখানুভব হয়। তাকে বলে ভূমানন্দ।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদবুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্তিতশ্চলতি তত্বতঃ।। (গীতা ৬।২১)

এই অবস্থায় এলে যোগী আত্মস্বরূপ ভাব থেকে কোনো মতেই বিচলিত হন না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্যসত্যই নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন জেনে তোতাপুরীর আর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সজোরে বললেন—'য়হ ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়। সত্যি করে নির্বিকল্প সমাধি। আর তাও কি না মাত্র তিন দিনে!'

এবার গুরু শিষ্যকে সমাধি ভঙ্গ করাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। প্রক্রিয়া শুরু করলেন। 'হরি ওম' মন্ত্রের গম্ভীর উচ্চারণে পঞ্চবটী মুখরিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধি অবস্থা থেকে বাহ্যদশায় ফিরে এলেন।

শিষ্যের সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্তি হওয়ায় তোতাপুরী সন্তুষ্ট হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নির্বিকল্প সমাধি ভূমিতে ঠাকুরকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস কাল দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন।

শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী ছিলেন সর্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ মহাজীবনের প্রায় ১০০ বছর কাল তিনি শুধু পরিব্রাজনে অতিবাহিত করেছিলেন। বহতা পানি, রমতা সাধু—সন্ন্যাসী জীবনের এই আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পর্যটন কালে কোনো স্থানে তিনি তিন রাত্রির অধিক সময় থাকতেন না। সঙ্গে সম্পত্তি বলতে একটা লোটা, একটা চিমটা, একটা চর্মাসন ও একটা মোটা চাদর বা কম্বল। নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হওয়ার দরুন তিনি সবসময় দিগম্বর থাকতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই তাঁকে 'লেংটা' বলে ডাকতেন। লোটা আর চিমটা দু'টোকেই রোজ মেজে ঘসে চকচকে করে রাখতেন। কোনো দাগ থাকত না। ব্রহ্মচারী হয়েও তোতাপুরী নিত্য ধ্যানাভ্যাস করতেন এবং সমাধিতে থাকতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বললেন, তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েছে, তবে আর নিত্য ধ্যান করা কেন? তোতা লোটার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, কি রকম উজ্জ্বল দেখছ, রোজ না মাজলে অমনটা থাকত কি? মনটাও তাই। নিত্য ধ্যানাভ্যাস না থাকলে মলিন হয়ে পড়বে।

—আর যদি সোনার লোটা হয়? তা হলে তো রোজ না মাজলেও ময়লা হয় না। ঠাকুরের যুক্তি তীক্ষ্ণ ছুরির মতোই ধারাল। তোতা সহাস্যে হার মেনে বললেন, 'সচ বাত হ্যায়'।

তবে ঠাকুর গুরু তোতাপুরীর কথার ভাব ধরে রেখেছিলেন। শিষ্য ভক্তদের তোতার কথা বলে নিত্য ধ্যান জপ করার উপদেশ দিতেন। আবার ঠাকুরের সোনার লোটার কথাটাও গুরু তোতার মনে দাগ কেটে দিয়েছিল।

ব্রহ্মদর্শন হলে সাধকের জাগতিক কোনো বস্তুর প্রতি মোহ থাকে না। মন শুধু ব্রহ্মানন্দেই রমণ করে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। তখন তাঁর এক অপূর্ব সমদর্শিতার ভাব জন্মায়। আপন

পর ভেদবুদ্ধি থাকে না। শত্রু-মিত্র, শীত-গ্রীষ্ম, উচ্চ-নীচ, মান-অপমান সবই তাঁর কাছে সমান। সব কিছুকেই সেই পরমাত্মার বিভূতি বা প্রকাশ হিসাবে দেখেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানীর জগতে কোথাও কারোর প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, কোনো বন্ধন নেই, তিনি জীবন্মুক্তপুরুষ। তিনি নিজেকে স্বয়ং পরমাত্মার সাযুজ্য মনে করেন। তিনি সর্ব বাসনা কামনাকে ত্যাগ করেছেন, এমনকি মৃত্যুকেও জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। তিনি নির্ভীক হৃদয়। সংসার-সাগরে তিনি হংসরাজের মতো পরমহংসরূপে বিরাজ করেন। প্রকৃত জ্ঞানী সন্ন্যাসী আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে আত্মারামকে লাভ করে থাকেন। যিনি সচ্চিদানন্দ সাগরে সর্বদা বিচরণ করেন তাঁর আবার কাকে ভয়? কিসের ভয়? তিনি তো সর্বদা ভূমানন্দে আছেন। বাহ্যজগৎ তখন তাঁর দৃষ্টিতে মায়ার প্রকাশ মাত্র। তিনি পূর্ণব্রহ্মে সর্বদা লীন থেকে পূর্ণত্বলাভ করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মই। তিনি অসহভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর আহার-বিহার, জাগরণ-বিশ্রাম, নিদ্রা কোনো কিছুর অভাব নেই। সংসারে বাস করলেও ব্যাকুলতা, চঞ্চলতা, চিত্তবিক্ষেপ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নিরাশা কিছুই তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না। এই অবস্থায় সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মের উপস্থিতি প্রত্যক্ষগোচর হয়। এই অবস্থা বস্তুত পক্ষে সাধনার অতি উচ্চ অবস্থা। জ্ঞানী সন্ন্যাসী তখন অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে জন্ম-মৃত্যুকে উজিয়ে যান। তিনি তখন আর দেহাত্মবন্ধনে আবদ্ধ নন। তিনি অমর, অজর, অবিনশ্বর, চিরন্তন শাশ্বত সনাতন সত্তা মাত্র। তোতাপুরী তেমনি পরমজ্ঞানী সন্ন্যাসী। ওড়িয়া শিষ্যরা একবার তোতাবাবাকে তাঁর জীবনী লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার তো জন্মই হয়নি। তবে কি করে তোমরা আমার জীবনী লিখবে? বস্তুত পক্ষে পরব্রহ্মে যিনি স্থির, অচঞ্চল, ব্রহ্মানন্দ সাগরে যিনি সর্বদা অবগাহন করছেন সেই ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠের এর চেয়ে আরো সুন্দর উক্তি কি হতে পারে?

একে বলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। নির্বিকল্প সমাধি যোগেই একমাত্র এই চরম অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, এমন দশা প্রাপ্ত হলে আর শরীর থাকে না, শুকনো পাতার মতো খসে পড়ে। টেঁকে না। এ হল সাধনার উচ্চকোটি চরম অবস্থা। এই অবস্থাপ্রাপ্ত বিরল পুরুষেরা কোনো সত্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহুজনহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরা সাধারণত অচিন্ত্য দিব্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। তাঁরা যতদিন ইচ্ছা লোককল্যাণের জন্য জগতে দেহধারণ করে থাকতে পারেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বেদান্তী গুরু তোতাপুরী চল্লিশ বছরকাল কঠোর তপস্যা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন এবং তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই তিনি স্বেচ্ছাবিহারী হয়ে আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণে বার হন।

ঠাকুর তোতাপুরী স্বামীর নির্ভীক হৃদয়ের কথা বলতেন। নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অগ্নিকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তোতাপুরীও পঞ্চবটীতে সব সময় ধুনি জ্বালিয়ে রাখতেন। শীত গ্রীষ্ম কি বর্ষা দিনে রাতে কখনো তাঁর ধুনি নিভে থাকত না। কোনো কিছু আহার্য গ্রহণ করার আগে অগ্নিতে আহূতি দিতেন। রাতে ধুনি জ্বালিয়ে সমাধিতে বসে থাকতেন। দিনের বেলায় ধুনি জ্বালিয়ে পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। লোকেরা ভাবত তোতাপুরী নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু তা নয় তিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকতেন।

একদিন রাতের বেলায় তোতাপুরী ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানে বসেছেন। চারদিক শুন শান। নিস্তব্ধ। বাতাসও বন্ধ। সকলে নিদ্রামগ্ন। জঙ্গলের ভেতর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের চূড়ো থেকে মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। গাছপালারা স্তব্ধ হয়ে আছে। হঠাৎ করে পঞ্চবটীর গাছগুলো কেমন দুলতে শুরু করল। একটা গাছের ওপর থেকে এক দীর্ঘকায় পুরুষ নেমে এসে তোতার পাশে দাঁড়াল। তারপর সেও ধুনির পাশে বসল। তোতা নির্ভীক কণ্ঠে দিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

—আমি দেবযোনি ভৈরব। এই গাছে থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি।

—বেশ তো, তাহলে তুমিও যা, আমিও তা। আমরা দুজনেই ব্রহ্মের প্রকাশ। এস এখানে বসে দু'জনে ধ্যান করি।

অচেনা পুরুষটি হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। তোতা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হলেন।

পরের দিন সকালে তোতাপুরী অবশ্য ঠাকুরকে সেই অদ্ভুত পুরুষটার কথা বললেন। তখন ঠাকুর বললেন, আমার নিজেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। লোকটা আগেও আমায় দেখা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর জানালেন যে অনেকদিন আগে পঞ্চবটীতে কোম্পানী বারুদ কারখানা করার জন্য জমি কিনতে চেয়েছিল। সেই নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে মথুরবাবু মামলা করেছিলেন। তখন ঠাকুরের বেশ দুঃশ্চিন্তা হয়েছিল। সেই সময় ওই ভৈরব গাছ থেকে ঠাকুরকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, কোম্পানী পঞ্চবটীর জমি নিতে পারবে না। মামলায় হেরে যাবে। ভৈরবের কথা ফলে গিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের মতে সম্ভবত তোতাপুরী স্বামীজী পাঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গুরুজী কুরুক্ষেত্রের কাছে লুধিয়ানা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তোতার গুরুর গুরুদেবও মস্ত যোগী ছিলেন। তিনি একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তোতার গুরু সেই মঠের মোহন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গুরুর দেহত্যাগের পরে তোতাপুরীজীও মঠের মোহন্ত হন।

শ্রীমৎ তোতাপুরী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা তিনি শিষ্যদের জানিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই জানা যায়, তোতা অতি বাল্যবস্থায় গুরুর আশ্রমে আসেন। গুরুর সন্নিধানে বেদান্ত শিক্ষা পাঠাভ্যাস করেন। মঠে কঠোর নিয়ম কানুন মেনে কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। পরে কঠোর তপস্যা করে গুরু কৃপা বলে বেদান্ত সাধন রহস্য অবগত হন। তিনি জানিয়েছিলেন তখন মঠে প্রায় সাতশো সন্ন্যাসী শৃঙ্খলা সহকারে বেদান্ত অনুশীলন করত। আগেই বলা হয়েছে, মঠের নিয়ম কানুন অত্যন্ত কঠোর ছিল। নাগা সন্ন্যাসীরা শমদমাদি কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বেদান্ত চর্চার জীবন গড়ে তুলতেন। আহার-বিহার, পরিধান, জীবনচর্চা সকল বিষয়েই কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হত। প্রথমে গদির আসন পরে কঠিন আসন, চর্মাসন অথবা মাটিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করতে হত। পরিধান কমিয়ে আনা হত। তারপর দিগবসন (উলঙ্গ) থাকা অভ্যাস করতে হত। এইভাবে ক্রমশ তাদের অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি) থেকে মুক্ত হবার শিক্ষাপ্রদান করা হত। তোতাপুরী ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, মঠের মোহন্ত পদ খালি হলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি পরমহংসপদবাচ্য বলে গণ্য হতেন তাঁকেই মোহন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হত।

শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী বাল্যাবধি মঠে গুরুর আশ্রয়ে বড় হয়েছিলেন। সংসারের মায়া মোহাদি আসক্তি থেকে দূরে থেকে সন্ন্যাসজীবন গড়ে তোলার জন্য তিনি কঠোর বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্রহ্মচারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দেহের গড়ন ছিল পশ্চিম ভারতীয়দের মধ্যে লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ। তিনি সর্বদা দিগম্বর থাকতেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কঠোর ব্রহ্মচর্যের তেজ ফুটে বেরুত। তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তিনি জানতেন হিমালয় প্রদেশে অনেক সাধু তপস্বীগণ তপস্যা করেন। তিনি হিমালয়ের দুরতিক্রমনীয় আকর্ষণে হিমালয়ে ছুটে গিয়েছেন। নানা তীর্থে পরিভ্রমণ ও তপস্যা করেছেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের নির্জন পবিত্র পরিবেশ তাঁর বেদান্ত ব্রহ্মচিন্তনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই পরম সত্য যে, নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্মত্যাগই আসল সন্ন্যাস নয়। পরন্তু অনাশ্রিত কর্মফল ত্যাগ করে বিবিদিষু সন্ন্যাসী হয়ে ভগবৎপ্রীতির জন্য লোককল্যাণকর ব্রতপালনই প্রকৃত সন্ন্যাস। যিনি বহুজনহিতার্থে এবংবিধ কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রকৃতপক্ষে জনহিত ব্রত পালনের মাধ্যমে সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করার জন্যই তাঁর মহাপরিব্রাজকরূপে আত্মপ্রকাশ। তাঁর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয় ততক্ষণ কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করে যাবতীয় শাস্ত্রবিহিত কর্ম করাই কর্মযোগ। জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্মপরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। ফলে ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতি

হবার সম্ভাবনা। বেদান্তী তোতা শঙ্করপন্থী পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। যোগসিদ্ধ ও ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইচ্ছা করলে যোগারূঢ় হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে বসে ভূমানন্দ সম্ভোগ করতে পারতেন। তিনি নিত্যই নির্বিকল্প সমাধির উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানে স্থির হয়ে চিদানন্দময় শিব স্বরূপতা উপলব্ধি করতেন। তবুও তিনি জীবকল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করে গীতোক্ত কর্মসন্ন্যাস জীবনের এক উজ্জ্বল আলোকময় রাজ্য উদ্ভাসিত করেছেন। সুদীর্ঘ কান্তিময় আজানুলম্বিত বাহু জটাজুটমণ্ডিত সৌম্যদর্শন জ্যোতিষ্মান দিগম্বর তোতাপুরী বাবা আমাদের মতো শত শত প্রাণে এনে দিয়েছেন অনাবিল দিব্য চেতনা ও ধর্মলাভের অনুপ্রেরণা। এখানেই তাঁর মহাপরিব্রাজক জীবনের যথার্থতা। ভূভারতের যেখানেই তিনি গমন করেছেন সেখানেই অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ও মোক্ষপিপাসু মানুষ তাঁর চরণ সন্নিধ্যানে এসেছেন। তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ উপদেশ বাণী শুনে পরিতৃপ্তিলাভ করে শান্তি পেয়েছেন। অধ্যাত্ম চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েছেন। নিজেদের অষ্টপাশ মুক্ত করার সংকল্প করেছেন। পরিব্রাজকাচার্যবর তোতাপুরীর সেটাই বড় অবদান।

আচার্য শঙ্করের মতো পদব্রজে তিনি সুদীর্ঘকাল অখণ্ড ভারতের সর্বত্র কাশ্মীর অনন্তনাগ, কৈলাস মানস, নেপাল তিব্বতের তরাই অঞ্চলে কখনো বা গঙ্গার অববাহিকায় যদৃচ্ছ পর্যটন করেছেন। তা নিজের প্রয়োজনে নয়। কারণ, মোহন্তজনের স্বভাব নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা নয়, লোকহিতে কল্যাণপূত কর্ম করা। যাত্রাপথে বহু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী আশ্রমী সাধু-সন্ত পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা ও ভারতীয় বৈদিক সনাতন ধর্মের আদর্শকে প্রচার করেছেন। বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনিও সকলকে সেই পরমব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করে প্রতি সম্মান করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে কঠোর শুষ্ক জ্ঞানতপস্বী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মানবদরদী উদার দয়ালুপ্রকৃতির। কত সাধারণ গৃহী ভক্তকে তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন তার হিসাব নেই। আবার অনেক বিরুদ্ধ মতালম্বীদের সঙ্গেও তিনি মুখোমুখি হয়েছেন। শাস্ত্রাদি বিচার ও ব্যাখ্যা করে তাঁদের উদার অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান দর্শনের পথে এনেছেন এবং তাঁদের কঠিন কুসংস্কার জটিল কুটিল আচারসর্বস্ব জীবনচর্চা থেকে মুক্তিলাভের সন্ধান দিয়েছেন। জ্ঞানমার্গী অদ্বৈত বেদান্তবাদী এই বরেণ্য মহাপুরুষের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছেন সকল বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের, সমাজের সকল স্তরের আবাল বৃদ্ধ বণিতা অসংখ্য মানুষ।

বাল্যাবস্থা থেকেই কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে শ্রীমৎ তোতাপুরী সংসার বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য পোষণ করতেন। পরমব্রহ্মের দর্শনলাভ করলেও তাঁর শক্তি মহামায়ার কথা জানতেন না। অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার অচিন্ত্য প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাই গৃহী সাধারণ মানুষদের ভক্তিভাবপূর্ণ জীবনচর্চা, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিপূজা অর্চনাকে তিনি কুসংস্কারসর্বস্ব বলে মনে করতেন। এর মূল কারণ অবশ্য অদ্বৈতবাদী তোতাপুরীর সাধনার ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ বলেছেন, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে যাঁরা তাঁর উপাসনা করেন তারা শ্রেষ্ঠ যোগী। আবার অব্যক্ত, কূটস্থ, ধ্রুব, অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসকগণও আমাকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ যেমন জ্ঞানলাভের মাধ্যমে সমাধিযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন তেমনি সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণও ভক্তিমার্গে নিষ্ঠা সহকারে প্রেমের পথে ভগবৎ দর্শন করেন। (দ্রষ্টব্য গীতা ১২।২,৪ শ্লোক)। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসক ও অব্যক্ত ব্রহ্মের সাধকগণ উভয়েই পরমব্রহ্মের অনুগ্রহলাভ করে থাকেন। সম্ভবত ভক্তিমার্গের সাধন-ভজনের মাধ্যমেও যে পরব্রহ্মের কৃপা লাভ করা যেতে পারে তা তোতাপুরী বাবার জানা ছিল না। পরে অবশ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সরল পবিত্র ভক্তিভাবের উপাসনার প্রভাবে এসে তিনি তাঁর মত বদলাতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য তিনি ভক্তিমার্গের যুক্তি স্বীকার করেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল হরিনাম কীর্তন। মনকৃষ্ণ, গুরুকৃষ্ণ, হরিগুরু, গুরুহরি, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র—প্রভৃতি উচ্চারণ করে ভক্তিভরে নাম কীর্তন করা। হাতে তালি দিয়ে নাম করতে করতে

ঠাকুর প্রভূত আনন্দলাভ করতেন। এমনকি বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও অভ্যাসবশতই তিনি এরূপ উচ্চৈঃস্বরে নামগান করতেন। এতে তোতাপুরী অত্যন্ত অবাক হতেন। বিশেষত তিনি বিস্মিত হয়েছেন এই কারণে যে ঠাকুর বেদান্ত বিদ্যার উত্তম অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কি করে একজন সাধারণ মানুষের মতো এমন আচরণ করছেন।

একদিন বিকাল বেলায় শ্রীমৎ তোতপুরী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেদান্ত বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসতে দেখে ঠাকুর কথা বন্ধ করে হাতে তালি দিতে দিতে নামকীর্তন শুরু করলেন। তাঁকে এরূপ করতে দেখে বেদান্তী গুরু বলে উঠলেন, আরে বেটা তুম, কিউ রোটি ঠোকতা হো। আসলে হিন্দুস্থানীদের অনেকে দু'হাতে ময়দার লেচি নিয়ে ফট ফট শব্দকরে রুটি বানায়। তোতা তাকেই রোটি ঠোকা বলেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোতার কথা শুনে বললেন, দূর শালা, আমি রুটি ঠুকছি কোথায়, ঠাকুরের নাম করছি।

তোতা আর কথা না বাড়িয়ে হাসতে লাগলেন। ঠাকুরের কাজে বিঘ্ন ঘটালেন না।

আর একদিন। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জ্ঞানী তোতাপুরী ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। ঠাকুরও একসময় সেখানে এসে ধুনির পাশে বসলেন। ইন্ধন যোগে ধুনি ক্রমশ জোরে জ্বলতে লাগল। গুরু ও শিষ্যের দু'জনের এক ভাব। এক মন, এক তান। দু'জনেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে নিবিষ্ট চিত্ত রয়েছেন। তাঁরা যেন জ্ঞানযজ্ঞেই আহুতি দিচ্ছেন।

দৈবমোবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুযপাসতে।

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি।। গীতা ৪।২৫

অর্থাৎ অন্যান্য যোগীরা দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সকল কর্ম আহুতি দেন।

গুরুশিষ্য দু'জনের মনই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান বিচারের অতি উচ্চস্তরে বিরাজিত। উভয়েই অদ্বৈত ব্রহ্মভাবে তন্ময় হয়ে আছেন। ধুনি তো নয় যেন স্বয়ং ব্রহ্মাগ্নি। লকলক করে আগুন উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠছে। তাঁদের উভয়ের আত্মা ধুনিস্থিত ব্রহ্মাত্মার সঙ্গে একত্বীভূত। সাধনার অতি উচ্চ স্তরে জ্ঞানযোগীদের সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নিতেই ভস্মীভূত হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতের্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। গীতা ৪।৩৭

(জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে। সেরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে।)

সাধনার এই অপূর্ব অবস্থায় হঠাৎ ছন্দ পতন ঘটে। বাগানের কোনো লোক তামাক সাজার জন্য এসে ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে তুলল। হঠাৎ তোতার নজর পড়ল সেদিকে। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লোকটাকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। এমন কি চিমটে দিয়ে মারতে পর্যন্ত উদ্যত হলেন।

ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা থেকেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, দূর শালা, দূর শালা! ঠাকুরের অমন ভাব দেখে তোতাপুরী জিজ্ঞেস করলেন, তুম লোগ হাসতা হ্যায় কিঁউ? ও লোগ কিতনা কসুর কিয়া, দেখা নেই তুম?

ঠাকুর হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন—তা তো দেখলুম। আর সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও জানা গেল। মুখে বলছ ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় নেই। জগতের সকল বস্তুই তাঁর প্রকাশ মাত্র। আর সেই ব্রহ্মের প্রকাশ মানুষকেই কি না মারতে যাচ্ছ! তাই বলি মায়ার কত বড় শক্তি!

এবার তোতা একেবারে চুপ। ঠাকুর যেন চাবুক মেরে তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তোতা নরম সুরে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। ক্রোধে আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ক্রোধ পরম

শত্রু। এখন থেকে আমি ক্রোধকে জয় করলাম। এই ঘটনার পর তোতাপুরীকে কেউ আর রাগতে দেখেননি।

ব্রহ্মবেদান্তী তোতাপুরী সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভাগবতী মায়া তাঁর সরল মন ও দেহের ওপর কোনো বিরুদ্ধ প্রভাব ফেলেনি। তাই তোতাপুরী পুরুষাকার অবলম্বনে ও আত্ম প্রচেষ্টায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ ও ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। অবিদ্যা রূপিণী মোহিনী মায়া তাঁর সরল মনে কোনো কলঙ্ক আরোপ করেননি। বাল্যকাল থেকে কঠোর সংযম ও জিতেন্দ্রিয় ভাব অবলম্বন করায় তোতাপুরী সহজেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মদর্শন ও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্মজ্ঞানলাভ এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' অর্থাৎ মা কৃপা করে পথ ছেড়ে না দিলে কিছু হবার উপায় নেই।

সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া তোতাপুরীর সাধনার সিদ্ধিলাভের পথ সরল করে দিয়েছিলেন, সে কথা তোতার উপলব্ধি হয়নি। এবার ভগবতী মহামায়া তাঁকে যেন সেই কথাই বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রীমৎ তোতাপুরী যোগবলে বলিষ্ঠ সুঠাম শরীরের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর শরীরে কখনো কোনো রোগ বা পীড়া আক্রমণ করতে পারেনি। তোতার নীরোগ দেহ, অটুট স্বাস্থ্য, লৌহদৃঢ় মনোবল। তিনি রোগ বালাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করতেন। সর্বদা পরিমিত আহার-বিহার, সংযমী ও কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। তাঁর সদাই ব্রহ্মানন্দে টলমল ভাব, ঈশ্বরদর্শনে মনও খুব প্রফুল্ল থাকত। কিন্তু বাংলার জল হাওয়া ও ঠাকুরের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসায় তোতাপুরী কয়েক মাস অবস্থান করতে করতে হঠাৎ কঠিন আমাশা রোগে আক্রান্ত হলেন। আমাশয় রক্ত আমাশয়ে পরিণত হল। রোগ ক্রমশ কষ্টকর ও পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। কথায় বলে শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম অর্থাৎ সাধন ভজনের জন্য শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার দরকার। কিন্তু বারবার পেটের যন্ত্রণা ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তোতাপুরীর সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটতে লাগল। সর্বদা যিনি ব্রহ্মচিন্তনে ও ব্রহ্মদর্শনে কাল কাটাতেন এখন রোগের প্রকোপ তাঁর দৃঢ় মনকে দুর্বল করে ফেলল। মন আর সাধনার উচ্চভূমিতে বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মন নিম্নভূমিতে বারবার নেমে আসতে লাগল। রোগ মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগল। মানসিক অস্থিরতায় শেষে এমন দশা হল যে, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে'। মনকে দমন করে তোতাপুরী সাধনার গভীরে ডুবতে চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। কিছুতেই রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না।

তখন জ্ঞানী তোতার ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁকে সঙ্কেতে জানাল—এস্থানে আর অবস্থানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যুক্তিবাদী তোতা ভাবলেন, শুধুমাত্র রোগের ভয়ে এমন অদ্ভুত সুন্দর মানুষটার (ঠাকুর রামকৃষ্ণ) সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাবেন? মানব শরীর সম্বন্ধে তোতার স্বচ্ছ ধারণা তো ছিলই। কৃমি-কীট ভস্ম বিষ্ঠা রক্ত মাংস মল মূত্র পূর্ণ নশ্বর পদার্থ বই তো কিছু নয়।

কৃমি কীট ভস্ম বিষ্ঠা দুর্গন্ধ মল মূত্রকম্।
শ্লেষ্ম রক্তত্বচং মাংসং তনুরিত্থং বরাননে।।

(শ্রীশ্রীগুরু গীতা (শ্লোক ৩৩)

তবে দেহের জন্য আর মায়া কিসের? রোগ হলেই শরীরকে ভোগ করতে হয়। তিনি যেখানে যাবেন সেখানেও তো রোগ হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞ তোতাপুরী জানতেন শরীরের সঙ্গে আত্মার কোনো যোগ নেই। আত্মা সৎ অসঙ্গ নির্বিকার সাক্ষীস্বরূপ। সুতরাং তোতা মনকে শাসন করেন। চঞ্চল হতে দেন না।

রোগের শুরু থেকে তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই যেন যেতে পারছিলেন না। ঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে গিয়েও মুখ ফুটে বিদায়ের কথা বলতে পারেননি। তিনি যখনই পঞ্চবটীতে ঠাকুরের সঙ্গে বেদান্ত নিয়ে আলোচনায় বসতেন, তখনই রোগের বিষয় বেমালুম ভুলে যেতেন। বিদায় নেবার প্রসঙ্গ কিছুতেই তুলতে পারতেন না। মহামায়ার এমনি লীলা, বোঝা দায়। এদিকে যত দিন যায়, তোতার রোগ ও শারীরিক কষ্ট বাড়তে থাকে। আবার তিনি যাই যাই করেও যেতে পারছেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মধুর সঙ্গ ত্যাগ করতেও ইচ্ছে হয় না। শেষে তোতপুরীর অমন সুন্দর নধর দেহ রক্ত-

আমাশয়ে ভুগে ভুগে ক্রমশ ক্ষীণ হতে লাগল। ঠাকুর ইতি পূর্বেই তোতার জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে কোনো কাজ হয়নি। এবার মথুরাবাবুকে বলে বিশেষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালেন। তোতার দেখাশোনা সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি রাখলেন না। কিন্তু কোনো উপকার হল না। বরং রোগের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলল। তোতার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। তিনি আর শুয়ে থাকতেও পারছিলেন না। শরীরের কষ্ট ভোলার জন্য তোতা সমাধিমগ্ন হলেন। কিন্তু মন ক্রমশই অসুস্থ শরীরের দিকে ছুটে চলল। শরীর নশ্বর পঞ্চভূতের তৈরী পঞ্চভূতেই লীন হবে। তত্বজ্ঞ তোতা তা জানতেন। তাই তিনি গভীর সমাধিতে ডুব দিয়ে মনকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মন যেন কিছুতেই বশ মানার নয়। শরীরটাই তাঁর ধ্যান উপাসনায় বাধ সাধছে। তাই তিনি রোগক্লিষ্ট দেহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন। ঠিক করলেন গঙ্গাবক্ষে শরীর বিসর্জন দেবেন। এক রাতে তিনি পঞ্চবটী ছেড়ে গঙ্গায় নামলেন। ক্রমশ নদীর মাঝখানে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি যতই এগুতে থাকেন গঙ্গার জল আর হাঁটুর ওপর ওঠে না। পরে আরোও এগিয়ে চললেন ভাবলেন পরে জল বেশী হতে পারে। কিন্তু জল হাঁটুর ওপর কিছুতেই ওঠে না। তোতপুরী হাঁটতে হাঁটতে নদীর ওপারে চলে গেলেন। কিন্তু জলে দেহ বিসর্জন দেবার মত জল পাওয়া গেল না। অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে। যেন ছায়ামূর্তি। তোতা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, একি দৈবী মায়া? ডুবে মরার মতো জল নদীতে নেই! কি আশ্চর্য!! এই অবস্থায় তোতার এক অপূর্ব দর্শন হল। তিনি দেখলেন মন্দিরের জগদম্বা যেন বিশ্বমূর্তি হয়ে বিরাজমানা। তাঁর তনু মন দেহে এক অপূর্ব অনুভূতি হল। সবই যেন বিশ্বময়ী মাতৃমূর্তি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই জগদম্বা মা বিরাজ করছেন। যে দিকে তাকান সেদিকে তিনি মাতৃরূপে বিরাজিতা। তাঁর জীবন মৃত্যু সকলই মা। জগতে সেই মাতৃমূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নেই। এক অস্তিত্বে বিরাজিতা। জগজ্জননী মা যেন বলছেন—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। (চণ্ডী ১০।৪)

একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি ব্যতীত জগতে দ্বিতীয়া আর কে আছে? তোতা ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন জগদম্বা মা, চোখ বন্ধ করেও মাকেই দেখতে পেলেন। তাঁর ভেতর বার সকলই মাতৃময় হয়ে উঠল। মায়ের অসামান্য প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কোনো উপায় নেই। জগন্ময়ী মায়ের ইচ্ছা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মরারও উপায় নেই। মন-বুদ্ধি-শরীরের পরপারে তিনি, তিনি তুরীয়া, তিনিই নির্গুণা। তোতা এতকাল যাকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেছেন, এই সেই ব্রহ্মময়ী মা। শিব-শক্তি যেমন অভেদ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি তেমনি অভেদ। তোতার অপূর্ব এক অনুভূতি হল। তিনি 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে উঠলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী তোতা হলেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। অদ্ভুত ভাবান্তর হল তাঁর। সর্বকল্যাণময়ী মায়ের চরণে নিবেদন করলেন নিজেকে। আপন বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট রাখলেন না। মাতৃচরণে তাঁর পূর্ণ শরণাগতি।

তোতা আগের মতো আর কঠোর শুষ্ক সন্ন্যাসী নন। যে ভক্তি মার্গকে তিনি উপহাসের চোখে দেখতেন। এখন মহামায়ার কৃপায় নিজেই ভক্তিভাবে গদগদ হলেন। যেমন ভাবে গঙ্গা পার হয়ে এসেছিলেন, তেমনি 'মা মা' করতে করতে ফিরে এলেন। রোগ বালাই কোথায় উবে গেল। শরীর মন শীতল হল।

শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ কি করে সম্ভব! যাঁকে তিনি কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি, চাননি, সেই পাষাণময়ী জগদম্বার কি অপূর্ব দিব্যশক্তি, কি অপূর্ব লীলা! এতকাল ধরে তোতাপুরী নিরাকার অব্যক্ত ব্রহ্মের ধ্যান করে এসেছেন আর আজ তাঁর এক অদ্ভুত অত্যাশ্চার্য অভিজ্ঞতা হল। এতকাল যাবৎ লালিত ধ্যান-ধারণা সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ, এক ও অভিন্ন। ধুনির পাশে বসে তোতাপুরী সারারাত শ্রীজগদম্বার ধ্যান করলেন। তাঁর বেদান্ত সাধনার পরব্রহ্মই ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহ ভালোবাসা ভক্তিতে পূজিতাজগদম্বা ভবতারিণী মা। তিনি সন্তুষ্ট হলে জগৎ সন্তুষ্ট; তিনি রুষ্ট হলে আর জগৎ থাকে না। সৃষ্টি স্থিতি লয় সব তাঁর ইচ্ছেতেই হয়।

জ্ঞানী তোতাপুরীর জীবনে নতুন এক সকাল এল। ঠাকুর সকালে তোতাপুরীকে দেখতে এলেন। দেখলেন তিনি পুরোপুরি বদলে গেছেন। তাঁর সেই রোগক্লিষ্ট কৃশ শরীর আর নেই। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশী হাসিখুশি প্রফুল্ল ও উৎসাহী দেখাচ্ছে। তাঁর শরীরে কোনো রোগের লক্ষণ দেখা গেল না। তোতা ঠাকুরকে নিকটে বসালেন। তারপর গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। তাঁর মাতৃদর্শনের কথা বললেন। তোতা বললেন, রোগ ছদ্মবেশে এসে আমার বন্ধুর মতো কাজ করেছে। আমার চোখ খুলে গিয়েছে। এতদিনে আমার সত্যদর্শন পূর্ণ হল। জগদম্বার কৃপায় তাঁর দর্শন পেলাম। আমার অজ্ঞতা ঘুচে গেল। এখন আমি পশ্চিমে ফিরে যাব। তুমি মাকে বলে আমার বিদায়ের ব্যবস্থা করো। আর আমি এখানে থাকব না। এখন ভালোই বুঝতে পারছি মহামায়া আদ্যাশক্তিই আমাকে জ্ঞান দেবার জন্য এখানে বেঁধে রেখেছিলেন। আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। এবার আমাকে বিদায় দাও।

গুরু তোতাপুরীর সত্যোপলব্ধি ও ভক্তিভাবের কথা শুনে ঠাকুর ভীষণ খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, ল্যাংটা, তুমি মাকে আগে জানতে না। সব ঝুট বলতে। এখন তোমার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। মা আমাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মময়ী অভেদ। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ।

পঞ্চবটীতে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল। পাখিরা কূজন করে উঠল। প্রসন্নচিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কুলুধ্বনি করে বয়ে চলল। গুরু ও শিষ্য গভীর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হলেন। তারপর দুজনেই হৃষ্ট চিত্তে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। মন্দিরে এসে দেখলেন মায়ের মুখখানিতে কেমন যেন হাসি হাসি ভাব। দু'জনেই ভক্তিনম্র চিত্তে মাকে প্রণাম করলেন। জগদম্বা যে তোতার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না। অন্তরের সংবাদ পেলেন তোতা এখন স্বচ্ছন্দে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে যেতে পারেন। মায়ের অনুমতি আছে। বস্তুত পক্ষে মা জগদম্বাই তোতাপুরীকে দক্ষিণেশ্বরে আকর্ষণ করে এনেছিলেন। প্রথমত ঠাকুরকে বেদান্ত গুরুর দীক্ষা দিতে আর দ্বিতীয়ত জ্ঞানী তোতাকে মায়ের তত্ব শিক্ষা দিতে। এখন উভয় কর্মই সুসম্পন্ন হয়েছে। এর কয়েক দিন পর তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন। আর কোনোদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফেরেননি।

পাঁচ

হিমালয় অঞ্চলে দীর্ঘকাল সাধনা করার পর দিগম্বর বাবা একবার পুরীতে এসেছিলেন। তখন ইংরেজদের রাজত্বকাল।

তোতাপুরী নীলাচলে এসে শুনলেন, অঘোরী সম্প্রদায়ের গুরু কেনারাম পুরীতে এসেছেন। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে শ্রীজগন্নাথদেবের নির্দেশেই কেনারাম বাবা পুরীতে এসেছেন। কেনারাম অঘোরী বাবার আশ্রম (অঘোরী) মুঘলসরাইতে। তোতাপুরী তাঁকে দর্শন করার বাসনা করলেন। কেনারাম সবসময় অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতেন। সারা গায়ে তাঁর নোংরা এমনকি বিষ্ঠা মাখানো থাকত। এই অবস্থায় পুরীর রাস্তায় তাঁকে দেখা যেত। তিনি শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীর মন্দিরে গেলেন। কিন্তু প্রহরীরা তাঁর নোংরা দেহ, পাগলের মতো চেহারা দেখে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিল না। তাঁর সামনেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিল! কেনারাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, কি রে জগন্নাথ বাবা, আমাকে পুরীতে ডেকে নিয়ে এলি। আর তোর সেবায়েতরা আমার সামনে মন্দিরের কপাট বন্ধ করে দিল। তুই আমায় এভাবে ডেকে এনে এমন বেজ্জতি করলি কেন?

শোনা যায় এই কথার পর জগন্নাথ মন্দিরের কপাট আপনা থেকেই খুলে যায় এবং কেনারাম প্রাণ ভরে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন।

আর একদিন তোতাপুরী বাবা কেনারাম বাবাকে দর্শন করতে যান। তিনি মন্দিরে যাবার রাস্তায় বসেছিলেন। সেদিনও তিনি সারা গায়ে বিষ্ঠা মেখে দিব্যি সুখে বসে আছেন। এমন সময় সেই পথ দিয়ে

ওড়িশা রাজ্যের গভর্নর আসছিলেন। সেপাই ও প্রহরীরা দেখল রাস্তার পাশে সাধু কেনারাম নোংরা মেখে বসে আছে। তারা কেনারামকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। তাঁকে অনেক করে বোঝাল গভর্নর সায়েব আসছেন। সুতরাং রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই হবে। কেনারাম তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। সেপাইরা বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখাল। কিন্তু অঘোরী সাধু কেনারাম নির্ভয়। বললেন, মুঝে গোলি মার দো হাম হিঁয়াসে নিকাল নেহি যায়গা। সেপাইপ্রধান গভর্নর সায়েবকে গিয়ে সব নিবেদন করল। পাগল কেনারাম সাধুর কথা শুনে গভর্নর বললেন, আমাকে সাধুবাবার কাছে নিয়ে চল দেখছি। গভর্নর সায়েব কাছাকাছি আসতেই কেনারাম গা থেকে খানিকটা বিষ্ঠা নিয়ে গর্ভনর সায়েবের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। এবার সেপাইরা প্রমাদ গুনল। কী সর্বনাশ! কিন্তু গর্ভনর সায়েব কিছু বললেন না। বিষ্ঠা তাঁর গায়ে স্পর্শ করা মাত্রই যেন চন্দনে পরিণত হল। অতি সুন্দর দিব্যগন্ধে গভর্নর সায়েব মোহিত হয়ে গেলেন। কেনারাম সাধুর এই অলৌকিক কান্ড দেখে তিনি যারপর নাই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি একটা দামী মুক্তোর মালা নিয়ে সাধুর হাতে দিলেন। কেনারাম মুক্তোর মালাটা হাতে নিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবার গর্ভনর সায়েব রেগে গেলেন। সাধু বাবাকে বললেন, এত দামী পুরস্কার আপনি জলে ফেলে দিলেন?

—হাম তো কুছ ফেক নেহি দিয়া। তুম হাত জোড়কর সমুন্দর সে পানি লে আও, হাম দেখতা হ্যায়।

গভর্নর সায়েব সমুদ্র থেকে দু'হাত ভর্তি করে জল তুললেন। এবার তাঁর অবাক হবার পালা। একি হাতের জল কোথায় গেল, দু'হাত ভর্তি সুন্দর উজ্জ্বল মুক্তো, কোথা থেকে এল?

তত্বজ্ঞ তোতাপুরী কেনারাম বাবার বিভূতি দেখে মোহিত হলেন। তিনি কেনারামের কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কেনারাম তাঁকে বললেন—আমি তোমার গুরু নই। পরমহংসদেব পুরী বাবার কাছে যাও। তিনি তোমার পথ বলে দেবেন।

এর অনেক বছর পরে দিগম্বর বাবা গির্ণারীবন্তে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রম প্রসঙ্গে অলোচনা করার আগে আমরা বাংলায় তোতাপুরী বাবার শুভ পদার্পণের কথা উল্লেখ করব।

মুক্তিতীর্থ গঙ্গাসাগরে দিগম্বর বাবা বেশ কয়েকবার যাত্রা করেছেন। একবার সাগর থেকে উড়িষ্যায় ফেরার পথে রিষড়া অঞ্চলে এসে একটা পিপুল গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কলকাতার অদূরে এই গ্রাম্য প্রকৃতি বাবার মন ছুঁয়ে যায়। তিনি কয়েকদিন সেখানে বসে সাধনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তোতাপুরী বাবার চেহারা ছিল আকর্ষণীয়। দোহারা পাঞ্জাবী চেহারা। দীর্ঘকায়, দিগম্বর, বলিষ্ঠ উজ্জ্বল কান্তিমান। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বার হচ্ছে। তখন মুটুকধারীলাল ছিলেন স্থানীয় জমিদার। জি.টি রোড থেকে Hesting Mills, ফটিক বাজার গোয়ালাপাড়া ছিল তাঁর জমিদারী এলাকা। দিগম্বর বাবাকে বৃক্ষতলে দেখে লালজী (সকলে মুকুটলালকে ঐ নামে অভিহিত করত) তাঁর কাছে এসে প্রণাম করলেন। লালাজী ধার্মিক মানুষ। তিনি দিগম্বর বাবাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—সাধুবাবা আমার বাড়ীতে আপনার একটু চরণধূলি দিয়ে ধন্য করুন।

দিগম্বর বাবা সর্বত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। মায়ামুক্ত সংসারবিরক্ত মহাপুরুষ। তিনি সংসারীর সেবা নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মৃদু হেসে বললেন, বাবা আমি সন্ন্যাসী মানুষ। কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে থাকি না। আমি বরং এখানে এই বাগানে কোনো গাছের তলায় কয়েকটা দিন থাকব। তুমি ইচ্ছা করলে এখানেই আমার সেবার জিনিস পাঠাতে পারো।— জায়গাটা আমার বেশ লাগছে। এখানে কয়েকটা দিন থাকব। গাছতলায় বিশ্রাম করব। আমাকে সামান্য রুটি দিলেই চলবে।

—বাবা, আপনার যেমন ইচ্ছে।

পিপুল গাছের গোড়ায় একটা ছোট ছাউনি করে দেওয়া হল। বাবা সেখানেই থাকতেন। জায়গাটা অনেকটা দ্বীপের মতো। পাশেই কয়েকটা জলাশয়। দিগম্বর বাবা সারাদিন সেখানে ধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে কয়েকজন ভক্ত আসতেন সাধুদর্শন করতে। তাঁরা দূর থেকে প্রণাম করতেন। কেউ কেউ নতুন পাত্রে কিছু দুধ, বা অন্য কোনো সেবার জিনিস আনতেন। দিগম্বর বাবা হয়ত ইচ্ছে হলে তার সামান্য কিছু গ্রহণ

করতেন। না হলে সবটাই ফেলে দিতেন। বা পাখিদের সেবার জন্য রেখে দিতেন। তোতবাবার যোগীবরের দেহ। জ্ঞানমার্গী তপস্বী। পার্থিব জগতের বিষয়ে উদাসীন। ব্রহ্মচৈতন্যে মগ্ন থাকতেন। তাঁর বাইরের আহার্য গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন হত না। সামনে ধুনি জ্বালিয়ে চোখ বুজে থাকতেন।

জমিদার মুটুকধারীলাল দিগম্বর বাবাকে রোজ প্রণাম করতে আসতেন। আগেই বলেছি এই স্থানটি ছিল জঙ্গলে পূর্ণ। ঘেঁটুফুল, আকন্দগাছ ও অন্যান্য ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে এখানে আসতে হত। একদিন সকালে বাবাকে প্রণাম করতে আসার সময় একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। মুটুকধারীলালকে গোখরো সাপে ছোবল মারল। মুটুকধারীলাল সাপের বিষে ঢলে পড়লেন। একটু পরেই চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। জমিদার লালজীকে সাপে কামড়েছে। মুটুকলালজীর ছেলে রাধারমণ তখন যুবক। তিনি ছুটে এসে দেখলেন বাবার দেহ নিষ্প্রাণ। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি দিশাহারা হয়ে দিগম্বর বাবার কাছে ছুটে গেলেন। বললেন, সাধু বাবা, আমার বাবাকে কেউটে সাপে কেটেছে। বাবার মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে।

তোতাবাবা যেন চমকিত হলেন। হঠাৎ বললেন, কে বলল তোর বাবা মারা গেছে। ও ঘুমাচ্ছে। চল যাই।

বাবা গঙ্গাসাগরের পুণ্যবারি কমণ্ডুলুতে ভরে এনেছিলেন। সেই জল লালজীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'লালজী, এবার ওঠ।' সকলে অবাক। সাধুবাবার মুখের কথা যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করল, লালজী যেন সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। উঠে বসলেন। তারপর দিগম্বর বাবার চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার কৃপায় লালজী নবজীবন লাভ করলেন। নাঙ্গা বাবার যোগবিভূতি দর্শন করে ভক্তরা সকলে হতবাক হলেন।

তোতাবাবা বললেন, যাও লালজী তোমার আর কোনো ভয় নেই। মকানমে যাও। একটু গরম দুধ খেয়ে বিশ্রাম করো।

সেই থেকে লালজীর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি জমিদারী চালাতেন। ঘোর বিষয়ী ছিলেন। সুদের কারবারও করতেন। এখন থেকে সব ছেড়ে দিলেন। সংসারে থাকলেও কোনো কিছুই করতেন না, শুধু ধর্মচর্চা ও পরকালের চিন্তা করতেন। বলতেন, এটা আমার জীবন নয়। এ জীবন দান করেছেন দিগম্বর বাবা।

এদিকে দিগম্বর বাবার মাহাত্ম্য-কথা শুনে চারদিক থেকে প্রচুর দর্শনার্থী ও ভক্তগণ আসতে লাগল। তারা এসে বাবার কাছে নানা দুঃখকষ্টের কথা নিবেদন করে প্রতিকার প্রার্থনা করতে লাগল। তাতে নাঙ্গা বাবার ব্রহ্মচৈতন্য ভাবনায় (ধ্যানে) ব্যাঘাত হতে লাগল। তখন তিনি পুরীতে ফেরার সংকল্প করলেন। লালজীর ছেলে রাধারমণলালকে তোতাপুরী খুব স্নেহ করতেন। তিনি তাকে বললেন, বাবা, আমি গির্ণারীবন্তে ফিরে যাচ্ছি। তুমি এই জায়গাটায় একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করো। এখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে না। বিদ্যালয়ের দরকার।

সর্পদংশনের পর লালজী আরোও প্রায় পাঁচ বছরকাল বেঁচে ছিলেন। রাধারমণও দিগম্বর বাবাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি প্রথমে একটা শহীদ আশ্রম তৈরী করলেন। তিনি নিজে শিক্ষাবিদ ছিলেন না। কিন্তু দিগম্বর বাবার কথাকে মর্যাদা দিতেন। তাঁকে গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করতেন। পরে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিগম্বর বাবার আদেশের কথা জানালেন এবং স্কুল করার জন্য ১০ বিঘা জমি দান করলেন। সেখানে বর্তমানে রিষড়া হিন্দি হাইস্কুল হয়েছে।

নাঙ্গা বাবা যে পিপুল গাছটির তলায় পর্ণকুটিরে থাকতেন পরবর্তী কালে সে গাছটি কেটে ফেলা হয়। কিন্তু গাছটি মরেনি। পুনরায় সেখানে পত্রপল্লব সমন্বিত হয়ে পিপুল গাছটি আবার বড় হয়ে উঠেছে। এখন তার গোড়া বাঁধানো হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা পিপুল গাছটিকে 'নাঙ্গাবাবা গাছ' বলে থাকে।

গির্ণারীবন্তে বালিয়ারী পাহাড়ের ওপর দিগম্বর বাবার অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম। পুরীর স্বর্গদ্বার থেকে চার কিলোমিটার ও লোকনাথ মন্দির থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে গির্ণারীবন্ত। লোকালয় থেকে দূরে জায়গাটা বেশ নির্জন। আগে জায়গাটা ছিল বেশ দুর্গম। লোকজনের বসতি না থাকায় এদিকে মানুষজন খুব একটা আসত না। এখন অবশ্য রাস্তাঘাটের অনেকটা সুবিধা হয়েছে। আগে এদিকে আসার যানবাহন বলতে ছিল গরুর গাড়ী ও সাইকেল রিক্সা। তাও ওই বালিয়ারী টিবির গোড়া পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে ওপরে উঠতে হত। তখন এখানে কাঁটা ঝোপঝাড় জঙ্গলে নানা জাতের জীবজন্তুরা থাকত। সন্ধ্যার সময় শিয়াল, হায়না বেরুত। দিনের বেলায় গাছপালায় দৌরাত্মি করত কালোমুখো হনুমানেরা। বালিয়ারী গর্তে লুকিয়ে থাকত নানাজাতের বিষাক্ত সাপ। মাঝে মাঝে পথের ওপর বালিতে শুয়ে থাকত তারা। তবে দিগম্বর বাবার কৃপায় কাউকে দংশন করত না। আবার অনেক সময় বাবার ঘরের ভেতরেও সাপেদের দেখা যেত। বাবা বলতেন, ওরা কাউকে হিংসা করে না। প্রাচীন কালে আরণ্যক পরিবেশে ঋষিদের আশ্রমের মতোই দিগম্বর বাবার অদ্বৈত আশ্রম। মোটামুটি ভাবে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দিগম্বর বাবা প্রায় পাকাপাকি ভাবে এই আশ্রমেই অবস্থান করতেন। বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকলে আশ্রম ছেড়ে কোথাও যেতেন না। কিছুদিন বাইরে থাকার পর যথারীতি আশ্রমে ফিরে আসতেন।

এবার আশ্রম পরিবেশটা একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। রিক্সা বা অটো থেকে নেমে টিবির নীচে থেকে দেখা যাবে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দিগম্বর বাবার আশ্রম। স্থানীয় লোকেরা বলে তোতাপুরী বাবার আশ্রম। এলাকাটা বেশ বড়। সামনেই সুদৃশ্য তোরণ। তাতে ফুল পাতা আঁকা সুচারু শিল্পকার্য। তোরণের ওপরে প্রথমে ওড়িয়া নীচে ক্রমান্বয়ে হিন্দি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লেখা অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম, পুরী। তোরণের চূড়ায় কমলপদ্মের ওপর স্থাপিত ওঁকার গুরুব্রহ্মের প্রতীক। তার তলা দিয়ে কাঠের দরজা পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। এরপর বড় বড় চওড়া Slab পাতা সিঁড়ি ধাপে ধাপে ক্রমশ টিবির ওপর দিকে উঠে গেছে। চারদিকে সবুজ বনানী, গাছপালা, ঝাউগাছ, কাজুবাদামের ঝোপ। বেশ শান্ত নির্জন পরিবেশ। খুব বেশী দর্শনার্থী এদিকে পা বাড়ান না। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে আর একটা তোরণ। সামনেই দিগম্বর বাবার সমাধি মন্দির। চূড়োটি গম্বুজাকৃতির একটু লম্বা ধরনের। ভিতরে দিগম্বর বাবার ধ্যানস্থ শ্বেতপাথরের মূর্তি। অপূর্ব জীবন্ত যেন। রত্নবেদিকায় বসানো আসনে ব্যাঘ্রচর্মের ওপর আরেকটা প্রতিকৃতি। বর্ণময় মাল্যচন্দনে ভূষিত। রত্নসিংহাসনের ওপরে রয়েছে প্রণব ওঁকার। পিছনে ত্রিশূল। বাবার আসনের নীচে ব্রহ্মাগ্নির প্রতীক দীপাধার। দর্শনার্থী ভক্তগণ বিনম্রচিত্তে বাবাকে প্রণাম জানান।

সমাধি মন্দিরের পাশেই বাবার বিশ্রামগৃহ। অতি সাধারণ। কিন্তু পরিপাটি করে সাজানো। আসবাব বলতে একটা বড় সেগুন কাঠের পালঙ্ক। তার ওপর গদি, একটা চাদর ও তাকিয়া। পালঙ্কের চাদরটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাতে অঙ্কিত বাঘের মুখের ছাপ। খাটের সংলগ্ন বাবার ব্যবহৃত ব্যাঘ্রচর্মের আসনটি সযত্নে কাঠের খাঁচার মধ্যে সংরক্ষিত। ভাগ্যবান বাঘটি মুখব্যাদন করে রয়েছে। এখনো জীবন্ত বলে মনে হয়। যেন ভক্তদর্শকদের পঞ্চরিপুকে গ্রাস করার জন্য মুখ হাঁ করে রেখেছে। শরীরের চামড়া পালঙ্কের ওপর বিছানো। পালঙ্কের সামনে বাবার বসার আরাম কেদারাটি বৃহৎ। দুটি বড় হাতলযুক্ত কেদারায় বিরাজিত দিগম্বর বাবার শ্বেত শ্মশ্রুধারী, মস্তকে জটারাশি মণ্ডিত শ্রী বিগ্রহ। তাঁর চরণপ্রান্তে জড়ো করা অঞ্জলি প্রদত্ত পুষ্পরাজি। পাশে বাবার শ্বেতমর্মর এক আবক্ষ মূর্তি। এই ঘরে রয়েছে বাবার নানা সময়ে তোলা বেশ কিছু আলোকচিত্র। মোটা কাঠের ফ্রেমে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। আর রয়েছে বাবার কমণ্ডুলু ও অন্যান্য সামগ্রী।

জ্ঞানতপস্বী দিগম্বর বাবার ঘরে দু'টি বড় কাঠের আলমারী। আলমারী দুটোতেই ভর্তি শাস্ত্রগ্রন্থ দর্শনার্থীদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। বাবার বেদান্ত চর্চার সাক্ষী যেন প্রাণবন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার যা বাবা সঞ্চিত রেখেছেন শিষ্য ভক্তগণের পথ নির্দেশিকা হিসাবে। তাতে রয়েছে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পঞ্চদশী, অন্যান্য বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও আরোও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী। গ্রন্থানুরাগী জ্ঞানতাপস বাবার অবাক করার মতো সংগ্রহ। স্বাধ্যায়, অধ্যয়ন, পাঠ, শ্রবণ, মননের ওপর বাবা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

নিত্য গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা চলত সকালে নিয়ম মাফিক। এ যেন গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ঋষিযজ্ঞের অনুষ্ঠান। বৈদিক সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক দিগম্বর বাবা আশ্রমে জ্ঞানযজ্ঞের নির্মল উজ্জ্বল প্রদীপ শিখাটিকে এইভাবে জ্ঞানচর্চা ও পাঠ শ্রবণের মাধ্যমে চির ভাস্বর করে রাখার প্রয়াসী ছিলেন। প্রতিদিন শিষ্য ভক্তদের কাউকে আলমারী থেকে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ এনে পাঠ করতে বলতেন। তিনি নিজে শুনতেন এবং মাঝে মাঝে ভক্তদের বিশেষ বিশেষ অংশ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই জ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ভাষ্য শুনলে তবেই শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকৃত আস্বাদন সম্ভব। কারণ শ্রীশ্রী গুরু গীতায় বলা হয়েছে—গুরু বক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম গুরু ভক্ত্যা চ লভ্যতে অর্থাৎ গুরুমুখেই ব্রহ্ম অবস্থিত, গুরুভক্তির দ্বারাই তা লাভ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম দিগম্বর বাবার যেন নির্জন শান্তির নীড়। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সাধনার আদর্শ পরিমণ্ডল। এখানকার প্রকৃতিতে আকাশে বাতাসে এক অনাবিল আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে যা দর্শনার্থী মাত্রেরই মনে কিছুটা ভাবান্তর ঘটায়। প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ এখানে এসে এমন মনোরম পরিবেশে সহজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বালীয়াড়ির ওপর থেকে পূর্বদিকে দূরে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। দক্ষিণে তরঙ্গমুখর বঙ্গোপসাগর আর উত্তর ও পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে গাছগাছালি ভরা গ্রাম্য পরিবেশ।

তোতাপুরী বা দিগম্বর বাবা ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসী। আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায় জ্যোর্তিময় কান্তি। যেন পরম ব্রহ্মের সচল বিগ্রহ। শ্মশ্রুধারী জটাজুট সন্ন্যাসী, সম্পূর্ণ দিগম্বর। জটারাশি পাকিয়ে পাগড়ীর মতো করে বাঁধা। প্রজ্ঞাবাদী বাবার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ব্রহ্মচর্যের তেজ ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর সামনে এলে মাথা আপনিই নুইয়ে আসে, ভক্তিতে শ্রদ্ধায়। এমন জ্ঞান তাপসকে দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। বাবার আকর্ষণী শক্তি এমনি অসাধারণ।

সকালে বারান্দায় খাটিয়ার ওপর এসে বসতেন। প্রতিদিনই দর্শনার্থী ভক্তেরা আসতেন। তাঁদের কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ইউনিভারসিটির রীডার, কেউ উকিল, ব্যারিষ্টার, সাংবাদিক, তান্ত্রিক, যোগী, বৈষ্ণবভক্ত, কীর্তনীয়া, ধনী জমিদার, দরিদ্র অসহায় অসংখ্য মানুষ, আর্ত পীড়িত সংসার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কত মানুষ। আবার বিদেশ থেকে অধ্যাত্ম পিপাসু গবেষকরাও মাঝে মাঝে এসে বাবার কাছে অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ে কঠিন প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতেন। বাবা কাউকে বিমুখ করতেন না। আবার যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকে উপযুক্ত উপদেশ দানে ধন্য করতেন।

দিগম্বর বাবা সাধারণত মৌন থাকতেন। খুব প্রয়োজন না হলে কথা বলতেন না। তিনি তামিল, তেলেগু ও অন্যান্য নানা ভাষা জানতেন। কিন্তু হিন্দি ভাষাই ব্যবহার করতেন। সাধারণ ভক্তরা এসে তাঁর চরণে দুঃখকষ্টের কথা নিবেদন করলে তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বেশীরভাগ সময় তিনি মৌনভাবে হাত তুলে আর্শীবাদ করতেন। ভক্তরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতেন। তাঁর চরণ স্পর্শ করার অনুমতি ছিল না। সামনে বেশীক্ষণ কাউকে বসতে দিতেন না। বলতেন, দর্শন হো গিয়া, যাও ঘুমাকে মন্দির উন্দির দর্শন করো। এরপরেও যদি কেউ বসে থাকতেন, তখন সেবককে ডেকে বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানকা কিতাব লে আও। সেবক উপনিষদ, পঞ্চদশী অথবা গীতা নিয়ে আসতেন। পাঠ শুরু হত। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর তত্ত্বের আলোচনা শুরু হত। তখন ওই দর্শনার্থী আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারতেন না। আপনিই উঠে চলে যেতেন। বাবার ছিল এমনি অদ্ভুত ব্যবস্থা।

দিগম্বর বাবা ছিলেন অন্তর্যামী পুরুষ। সব মানুষের মনের কথা বুঝতে পারতেন। একটি কুমারী মেয়ে বাবাকে দর্শন করার পর তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। সে প্রায়ই বাবাকে দর্শন করতে আসত। ফলে মেয়েটি বাবার দৃষ্টিতে পড়ে যায়। একদিন ভক্তিমতী মেয়েটি এসে বাবাকে প্রণাম করলে বাবা বললেন, 'তুমি এখনো অন্যের বাগান থেকে ফল চুরি করে খাও?' শুনে মেয়েটি স্তম্ভিত হয়ে যায়। আসলে তারা পুরীতে যে বাড়ীতে ভাড়া থাকত, সে বাড়ীর বাগানে অনেক পেঁপেগাছ ছিল। আর তাতে প্রচুর পাকা পেঁপে হয়েছিল। মেয়েটি পাকা পেঁপে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি তাই চুরি করে খেয়েছিল। ঘটনাটি সাধারণ হলেও

শিক্ষণীয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবা। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টির বাইরে কিছু থাকতে পারে না। তাই বাবার দৃষ্টিতে এড়ানো যায়নি। মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জিত হল। সে বুঝল বাবার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। তিনি তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। বাবা সাধারণ সন্ন্যাসী নন। তিনি ভগবানের অবতার। এই কুমারী মেয়েটি হলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মণিকা মিত্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রিডার ড. অনিল রায়চৌধুরী মহাশয় ছিলেন অকৃতদার। তিনি দিগম্বর বাবার যোগসিদ্ধির কথা শুনেছিলেন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নিয়ে আছেন। তাঁর মনে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কিছু জটিল প্রশ্ন জাগে। তিনি তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই পুরীতে গিয়ে দিগম্বর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গির্ণারীবন্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে বাবাকে দেখে তিনি ভাবাবেগে পুলকিত হলেন। বাবাও হঠাৎ তাঁকে কাছে ডেকে নেন। তারপর পরম স্নেহে তাঁর মাথাটি নিজের উরুর ওপর স্পর্শ করালেন। তখন অনিলবাবুর মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি বিলাপের সুরে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে যেন বাবার কোল ভাসিয়ে ফেললেন।

এবার বাবা বললেন, তুমি অসহায়ের মতো কাঁদছ কেন? ভগবান তোমায় অশেষ কৃপা করেছেন। সংসারের বন্ধনে তুমি আবদ্ধ নও। তোমাকে সাত্বিক মন ও বুদ্ধি দান করেছেন। আবার সংসারে পড়ে আছ কেন? এখানে চলে এস। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকো।

অনিলবাবু নিজের কর্মব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে বললেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছেন। সেই সব কাজ শেষ না করে কলকাতা ছাড়তে পারবেন না।

—না না আর দেরি কোরো না। সব ছেড়ে এখনই চলে এস আশ্রমে। বরং এখনই থেকে যাও আর ফিরো না। শোনো জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী—সুতরাং আত্মানুসন্ধানের কাজে অবহেলা করতে নেই। তুমি আমার কাছেই থাকো।

দিগম্বর বাবা এইভাবে ড. রায়চৌধুরীকে কত বোঝালেন। কিন্তু তিনি বাবার অনুরোধ রাখতে পারলেন না। কাজের খাতিরে কলকাতায় ফিরে এলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। দিগম্বর বাবাকে স্মরণ করে তিনি কেবলই বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দেহাবসান ঘটে। অন্তর্যামী দিগম্বর বাবা স্পষ্টই বুঝেছিলেন ড. রায়চৌধুরীর পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে—তাই তিনি জীবনের শেষ কটা দিন শুধু ব্রহ্মচিন্তায় অতিবাহিত করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? দিগম্বর বাবাও নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করেননি।

আর একদিন সকালে। পঞ্চদশী পাঠ চলছে। হঠাৎ এক ভক্ত এসে বসলেন। বাবাকে দূর থেকে প্রণাম করে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলেন। বাবার মুখের দিকে তৃষিতনয়নে কী যেন প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। বাবা ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে বাবা নিজেই বললেন, দর্শন তো হল, এবার চলে যাও।

লোকটা করজোড়ে মিনতি জানায়—বাবা, আর একটু বসি। আপনাকে দেখি।

—বাইরে রোদ চড়া হচ্ছে। কষ্ট হবে। দর্শন হয়ে গেছে আর বসে থেকে কি লাভ? বাবাই লোকটাকে তাগাদা দিয়ে তুলে দিলেন।

লোকটা চলে গেলে একজন ভক্ত বললেন, বাবা আপনি কৃপা করে বেচারা লোকটাকে একটু শাস্ত্রপাঠ শুনতে দিলেন না? লোকটির আশা হয়ত পূর্ণ হল না। সে দুঃখিত মনে চলে গেল।

দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন বাবা বললেন, তোমরা বালকমাত্র, এসব কি করে বুঝবে? লোকটার বউয়ের রাজ যক্ষা হয়েছে। বাঁচার কোনো আশা নেই। লোকটা বাসনা নিয়ে বসে আছে। আমার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে তার স্ত্রীর অসুখ ভালো করে দেবার জন্য। কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে বসে থাকলে শাস্ত্রপাঠ চলবে কি করে? ভাবের ছেদ পড়ে যায়। তাই তাকে উঠে যেতে বললাম।

তোতাপুরী বাবা ছিলেন মহাযোগী। সহজ সমাধি তাঁর করায়ত্ত। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ। ইচ্ছে মতো তিনি সমাধিতে মগ্ন হতেন। সিদ্ধাসনে বসে বসেই তিনি দেহের বন্ধন ছেড়ে অন্য জগতে চলে যেতেন। তারপর নিজ কর্ম শেষ করে আবার ফিরে আসতেন নিজের স্থূল শরীরে। ঘনিষ্ঠ শিষ্যরা অনেকেই তা লক্ষ্য করেছেন।

প্রতিদিন বাবা নির্দিষ্ট সময়ে বারান্দায় খাটিয়ার ওপর বসতেন এবং দর্শনার্থীদের দর্শন দিতেন। তাঁদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতেন। অনেক জ্ঞানীগুণী জনও আসতেন তাঁর কাছে। শাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতেন বাবাকে। বাবাও যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে তাঁদের ধন্য করতেন। অনেক সময় বিদেশী পণ্ডিত ও গবেষকগণও আসতেন বাবার কাছে। অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে বাবার সঙ্গে তাঁরা আলাপ করতেন।

একবার মিসেস রোজেনবার্গ নামে এক ফরাসী মহিলা তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় সাধনা বিষয়ে জানার জন্যে এদেশে আসেন। কলকাতায় এক জ্ঞানী মহাত্মার কাছে তিনি গির্ণারীবন্তের তোতাপুরী বাবার বেদান্তবিজ্ঞান বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের কথা শোনেন। সেই মহাত্মা মিসেস রোজেনবার্গকে পুরীতে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে পাঠান। তিনি গির্ণারীবন্তে এসে বাবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পড়লেন। আশ্রমেই একটা কক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। তিনি কিছুকাল আশ্রমে বাস করে বাবার সান্নিধ্যে কাটালেন। বাবার সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে আলাপ আলোচনায় তিনি সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। তিনি একটা ঘটনার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

সেই সময়ে শহরে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। চারদিকে বড় বড় সভাসমিতি চলছে। জাতীয় আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করার জন্য বহু দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও গান্ধীবাদী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সভায় বক্তব্য রাখছেন। গোপবন্ধু দাস ছিলেন স্কুল শিক্ষক, দেশপ্রেমী, সমাজসংস্কারক ও মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী। তিনি অনেক সভায় ভাষণ দিতেন। সম্ভবত একদিন তিনি সমাধি বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই সভায় মিসেস রোজেনবার্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি উৎসাহী হয়ে ভাষণ শুনে এসে তোতাপুরী বাবাকে বলেন। সব শুনে দিগম্বর বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এতে শুধু তোমার সময় নষ্ট হল। কারণ যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি নিজে সমাধি কি বস্তু তা জানেন না। যিনি সমাধিস্তরে উন্নীত হয়েছেন, তিনি কখনো কোনো সভায় তা প্রচার করেন না।

দিগম্বর বাবা দর্শনার্থীদের দেওয়া প্রণামী বা কোনো দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করতেন না। অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা বাবার দর্শনে আসতেন। তাঁরা প্রণামী, ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য জিনিসপত্র আনতেন। বাবা কোনোটাই স্পর্শ করতেন না। সেবকদের বলতেন টাকা পয়সা জিনিসপত্র সব তাদের ঘরে রাখতে। তারপর ধীরে ধীরে সেসব ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলতেন। পুরীর মহারাজা ও রাণীও বাবার ভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরাও বাবার দর্শনে আসতেন। বাবা তাঁদেরও আশীর্বাদ দিতেন।

অধ্যাত্ম পিপাসু ভক্তদের দিগম্বর বাবা সরল সহজ উপদেশ দিতেন। তাঁর কথা হল একালের মানুষ যোগসাধন করতে পারে না। তবে সৎসঙ্গ, সদগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, সাত্বিক আহার, সংযত জীবনযাপন, আত্মচিন্তন প্রভৃতি অনুশীলনের দ্বারা মোক্ষলাভ করতে পারে। তিনি নিরামিষ আহার করতে উপদেশ দিতেন। সাত্বিক আহার গ্রহণ করলে চিত্ত মন শুদ্ধ হয়। তাঁর কথা হল, যদি খাদ্য ও ভোগের প্রতি কোনো সংযম না থাকে তবে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলবে কি করে? বাবা শুধু উপদেশই দিতেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত আচার্য। যিনি আচরণ মানেন এবং আচরণ শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য বা গুরু। আগেই বলা হয়েছে তোতাপুরী বাবা অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন করতেন। দিনে সামান্য দুধ, দু'একটি ডাব, তরমুজ অথবা নিমের সরবৎ সেবা করতেন মাত্র। গুরুবাদ সম্বন্ধে তিনি বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মবিদ আচার্যের প্রয়োজন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুই শিষ্যের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানতে পারেন। সেই মতো তিনি শিষ্যকে ধর্মজীবন গঠনের উপদেশ দান করে থাকেন।

এক শিষ্যের প্রশ্নের জবাবে বাবা বলেন, নীচু মনের মানুষের অন্ন গ্রহণ করতে নেই। যারা সর্বদা অসৎচিন্তা করে, ধর্মের নামে অর্থ উপার্জন করে, তাদের হাতে খাবার খেলে মন নিম্নমুখী হয়ে যায়।

বাবা বলতেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু বা আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই ত্রিকালজ্ঞ গুরু হতে পারেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদ বলেছেন—"গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" অর্থাৎ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে সমিৎ কাষ্ঠ হাতে গমন করতে হয়।

তাঁর মতে সাধনার দু'টি পথ হল (১) দ্বৈত সাধন ও (২) অদ্বৈত সাধন। প্রথম মতানুসারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর। সব কিছুই তিনি। দ্বিতীয় মতে জগৎ প্রপঞ্চ বা স্বপ্ন মাত্র। জগতে অস্তিত্ব নশ্বর। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবে দিগম্বর বাবা সংসারী মানুষদের আত্মচিন্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ভক্তশিষ্যদের বলতেন, নিজেরা প্রস্তুত হও। নিজের মধ্যে যে অনন্ত সত্তা বর্তমান তাকে জানার চেষ্টা করো। তবেই মোক্ষলাভ সুলভ হবে। আত্মোপলব্ধি ভিন্ন স্থায়ী সুখলাভের অন্য কোনো উপায় নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। আত্মা সর্বব্যাপী সর্বদা বিরাজমান। মানুষ নিজেদের অবিদ্যা বা অজ্ঞতা হেতু আত্মাকে জানতে পারে না। এই অশুদ্ধতা দূর করতে পারলে শুদ্ধচৈতন্যের উদয় হয়।

বাবা বলতেন, যারা ধর্ম নিয়ে ও ভগবান নিয়ে ব্যবসা করে তাদের পক্ষে মোক্ষলাভ করা বড়ই কঠিন।

একজন প্রশ্ন করেন, বাবা আসল সাধু ও জাল সাধুর মধ্যে পার্থক্য কি করে করা যায়?

—অনেক সময় লোক নকল সাধুকেই আসল সাধু বলে ভুল করে। কিন্তু যিনি নিজেকে যোগবলে সংযত ও জিতেন্দ্রিয় করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর আচার আচরণ, জীবন চর্চা ও কর্ম অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তার মুখমণ্ডল সুন্দর পবিত্র ও শান্ত। তিনি লালসামুক্ত, প্রশান্ত চিত্ত।

একদিন দিগম্বর বাবা সকালে খাটিয়ার ওপর বসে আছেন। এমন সময় এক বিধবা মহিলা দর্শনার্থী এলেন। তাঁকে দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বলেই বোধ হল। বাবাকে সামনে দেখেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর ওই ভদ্রমহিলা একটু শান্ত হয়ে বাবাকে প্রণাম করলেন। বাবাও তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মহিলাটি তখনো কাঁদছিলেন। তাঁর কথায় যা জানা গেল তার মর্মার্থ হল যে, তাঁর স্বামীর দেহরক্ষা হলে তাঁর ছেলেমেয়ে ও তাঁর মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি করা হয়। তিনি তাঁর অংশ হিসাবে একলাখ টাকা পান। সেই টাকা তিনি বিশ্বাস করে তাঁর গুরুর কাছে গচ্ছিত রাখেন। কারণ তিনি তাঁর নিজের আত্মীয়দের বিশ্বাস করতেন না। কয়েক বছর পর তিনি গুরুদেবের কাছে তাঁর গচ্ছিত টাকা ফেরৎ চাইলে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলেন। এইভাবে প্রবঞ্চক গুরুর পাল্লায় পড়ে বিধবা মহিলা সর্বস্ব হারিয়েছেন। শ্রীশ্রীগুরু গীতায় আছে—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্য সন্তাপহারকঃ।। (শ্লোক ১২৯)

অর্থাৎ জগতে শিষ্যের বিত্ত লুণ্ঠনকারী অনেক গুরুই বিদ্যমান। কিন্তু শিষ্যসন্তাপহারক গুরু যথার্থই দুর্লভ।

দিগম্বর বাবা এই সব ছদ্মবেশী গুরুদের শৃগাল কুকুর প্রভৃতি ইতর যোনিপ্রাপ্ত প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করতেন। তিনি বলতেন, এই সব অসৎ গুরুদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হয়।

লোভী ও প্রবঞ্চক নকল সাধুদের প্রতি দিগম্বর বাবা এমন কঠোর মন্তব্য করলেও প্রকৃত জ্ঞানী যোগী ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসীদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাবান এবং আস্থাশীল। এব্যাপারে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

একদিন সকালে শাস্ত্রপাঠ পর্ব শেষ হয়েছে। চলছে নানাবিধ আধ্যাত্মিক আলোচনা। একজন ভক্ত বললেন, বাবা আমাদের মতো সংসারী মানুষেরা কেবল প্রবৃত্তি মার্গেই ছুটে চলে। ত্যাগী সাধুসন্ত ছাড়া আত্মজ্ঞান আর কে লাভ করতে পারে?

বাবা উত্তরে বললেন, কথাটা ঠিক নয়। আমি গৃহী লোকেদের মধ্যেও অনেক সৎ মানুষ দেখেছি। তারা যথেষ্ট ত্যাগ ও বৈরাগ্য সম্পন্ন। সাধু মাত্রই যে সৎ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান হয়,তা কিন্তু নয়। সাধুদের মধ্যেও অনেক ভেজাল আছে।

এই কথা বলে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বললেন যে তিনি যখন সাধনা ও পর্যটনের জন্য হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত স্থানে ভ্রমণ করতেন, তখন দেখেছিলেন কোনো কোনো সাধু লোহা লাগানো লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলছে। কারণ তাদের আশা যদি লোহা হঠাৎ সোনায় পরিণত হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই পরশমণি লাভ হতে পারে। তিনি আরোও দেখেছেন কিছু সাধু সাধন-ভজন ছেড়ে শরীর সাধনের জন্য কন্দমূল খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাওয়া কঠিন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্ত বলে ফেললেন, সেই জন্যই বুঝি একজন দেশনেতা 'সাধুরা সমাজের পরগাছা' বলে মন্তব্য করেছেন।

শোনা মাত্র দিগম্বর বাবার মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। তিনি রাগত স্বরে বললেন, শোনো, খাঁটি সাধুরা কিন্তু তোমাদের ওই নেতাদের একটা কীটের মতোই মনে করেন।

এবার বাবা একটা পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করলেন। বললেন, দধীচি মুনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী। দেবতা ও অন্যান্য মুনিগণও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মুনি ঋষিরা প্রায়ই দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় যেতেন সৌজন্য বিনিময় করতে। কিন্তু দধীচি মুনি কখনো যেতেন না। তখন ইন্দ্র ভাবলেন তিনি নিজে গিয়ে দধীচিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করবেন। একদিন দেবরাজ স্বয়ং এলেন দধীচির তপোবন আশ্রমে। তাঁকে প্রণাম করে বললেন, ঋষিবর, আপনি মোটেই আমার দেবলোকের সভায় যান না, তাই আমি নিজেই আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? অর্থাৎ আপনি আমায় কি রকম মনে করেন?

—কুকুরের মতো। নির্ভয়চিত্তে উত্তর দিলেন মহান দধীচি।

—এ আপনি কী বলছেন, ঋষিবর!

—আমি ঠিকই বলছি। ইন্দ্র তুমি রাজা, রাজত্ব করছ. ইন্দ্রিয় পুজোয় রত আছ। আর ইন্দ্রিয় চর্চা তো কুকুরের স্বভাব, তাই না? তাই তোমার আর কুকুরের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

কাহিনীটি বলে দিগম্বর বাবা প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে —প্রকৃত ও শক্তিমান যোগী যাঁরা তাঁরা ইচ্ছা করলেই সৃষ্টিতে পরম মঙ্গল সাধন ও চরম প্রলয় দুই-ই ঘটাতে পারেন। তাঁরা সাধারণ জীবকে অতি ক্ষুদ্র বলেই মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হলে সাধকযোগী যে উচ্চাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন, সেখানে তাঁদের ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে একত্মীভূত হয়ে থাকে। তাঁদের ইচ্ছাশক্তিই তখন পরমাত্মার ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

আপ্পা রাও নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় ভক্ত দিগম্বর বাবার কাছে আসতেন। বাবার চরণ সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর বিরাট ভাবান্তর হয়। তিনি বাবার একজন একান্ত অনুরাগী ভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রায়ই বাবাকে দর্শন করতে আসতেন। দিগম্বর বাবা আপ্পা রাওকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বাবা কৃপা করে তাঁকে তাঁর পূর্বজন্ম দর্শন করিয়েছিলেন। হয়ত বা তাঁর প্রারব্ধ শেষ হয়ে এসেছিল তাই বাবা তাঁকে বিশেষ কৃপা করলেন। একদিন আপ্পা ভক্তিভরে বাবার সামনে বসেছিলেন। বাবা হঠাৎ তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো এক অত্যাশ্চার্য ঘটনা ঘটল। আপ্পা নিজের নামরূপ দেহধারী সত্তা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। মানুষ বলা ঠিক হবে না, বলা ভালো এক অন্য সত্তা। তিনি বালিয়াড়ীর ওপর হঠাৎ দিব্য আনন্দে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। আনন্দের আতিশয্যে জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। সকলে আপ্পা রাও-র এই অদ্ভুত কীর্তি দেখে একেবারে অবাক। এ কি করে সম্ভব! লোকটা পাগল হয়ে গেল না কি? সকলে যখন এমন জল্পনা-কল্পনা করছেন তখন দিগম্বর বাবা একজন ভক্তকে বললেন, যাও আপ্পা রাওকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস। লোকটি আপ্পাকে ধরে আনলে দিগম্বর বাবা পুনরায় তাঁকে স্পর্শ করলেন। আপ্পা রাও যেন বাহ্যদশায় ফিরে এলেন। এবার

মুহূর্তের মধ্যে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। তবে কয়েক মুহূর্ত কাল আগের ঘটনা কোনো কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না।

দিগম্বর বাবা কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর দিব্য বিভূতি দ্বারা আপ্পা রাওয়ের চৈতন্যশক্তিকে জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর ভক্তের প্রতি অহৈতুকী অনুগ্রহের বিরলতম প্রকাশ। এই ঘটনার পর আপ্পা রাও আর বেশীদিন বাঁচেননি।

একদিন সকালে প্রারব্ধ বিষয়ে আলোচনা উঠল। বাবা বললেন। প্রারব্ধ খণ্ডন করা বড় কঠিন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা গল্প বললেন, এক গুরু তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন যে, আগামীকাল তার একটা বটগাছের তলায় মৃত্যু হবে। আর মৃত্যুকালে তার হাতের আঙুলে একটা সোনার আংটি পরা থাকবে। গুরুর কথা শুনে শিষ্যটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল আমি যদি এখান থেকে ছুটে পালিয়ে অনেক দূরে চলে যাই তবে হয়ত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাব। এই ভেবে সে সেখান থেকে ছুটে পালাল। অনেকটা দূরে ছুটে এসে সে পরিশ্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সেই পথ দিয়ে এক ধনী ব্যক্তি আসছিল। লোকটাকে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তার দয়া হল। সে তাকে তার গাড়ীতে তুলে নিল। তারপর অনেকটা দূরে গিয়ে একটা বটগাছের তলায় এল। ধনী ব্যক্তিটি চিন্তা করল, এখন এই বটগাছের তলায় সংজ্ঞাহীন লোকটাকে রেখে যাই। হয়ত কিছুক্ষণ পরে লোকটা সুস্থ হয়ে জ্ঞান ফিরে পাবে। লোকটাকে দেখে তার মনে হল এ নিশ্চয়ই গরীব। তাই দয়াপরবশ হয়ে সে তার নিজের আঙুল থেকে একটা সোনার আংটি খুলে লোকটির হাতের আঙুলে পরিয়ে দিল। তারপর তাকে গাছতলায় রেখে গাড়ী নিয়ে চলে গেল। অজ্ঞান লোকটি সেখানেই দেহত্যাগ করল। সুতরাং প্রারব্ধই তাকে বটবৃক্ষের তলায় টেনে এনে যেখানে তার মরার স্থান নির্ধারিত ছিল সেখানেই মৃত্যু ঘটাল। (শ্রীশ্রীদিগম্বর বাবা—মণিকা মিত্র)

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা হল।

কলকাতার এক ধনী আডভোকেট চরিত্রহীনতার ফলে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অনেক নামকরা ডাক্তার দেখিয়েও কোনো ফললাভ হল না। অবশেষে তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে পুরীর দিগম্বর বাবার মাহাত্ম্য ও যোগশক্তির কথা শোনেন। বন্ধুটি ছিলেন দিগম্বর বাবার স্নেহভাজন ভক্ত। রোগাক্রান্ত আডভোকেট বন্ধুকে ধরলেন। যেমন করেই হোক একবার দিগম্বর বাবার কাছে তাঁর রোগের কথা বলতে হবে। তিনি রাজী হলেন। এবার ভক্ত বন্ধুটি পুরীর গির্ণারীবন্তে গিয়ে পৌঁছলেন। পরের দিন দিগম্বর বাবাকে প্রণাম করে আডভোকেট বন্ধুর কথা সব খুলে বললেন। তারপর লোকটির রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন।

কিন্তু লোকহিতকারী স্পষ্টবাদী বাবা কঠোর ভাষায় বললেন, এতে তোমার কি উপকার হবে বলতে পারো? এর দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের পথ খুলে যাবে কি?

ভক্ত বন্ধুটি বললেন, না বাবা তা হবে না। তবে ইনি আপনার কৃপালাভের জন্য বার বার আমাকে বলেছিলেন। তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম।

বাবা বললেন, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তোমার বন্ধুর রোগের নাম পুরুষত্বহীনতা। মদ্যপান আর পরস্ত্রীগমনের ফলে সে এই রোগের শিকার হয়েছে। আগে এই দু'টো জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু সে তা কোনোদিনও ছাড়তে পারবে না। আমি তাকে কি করে বাঁচাবো? তার প্রারব্ধই তাকে এই কর্মভোগ করাচ্ছে।

পুরী থেকে ফিরে ভক্ত বন্ধুটি তাঁর অ্যাডভোকেট বন্ধুকে বাবার সব কথা বললেন। তিনি মাথা নীচু করে সব শুনলেন। মনে হল এক গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। বললেন, এ আমারই কর্মফল। বাবা অন্তর্যামী। তাঁর কথাই ঠিক। এই দুটি অপকর্ম থেকে আমি এ জীবনে আর রেহাই পাব না।

ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবা ছিলেন স্পষ্টবাদী। অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা করতেন না। ভক্তদের কল্যাণ কামনায় তিনি সদা সতর্ক থাকতেন।

হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় বাবার একজন স্নেহভাজন ভক্ত। কলকাতা থেকে পুরী এসেছেন। বাবার আশ্রমে আছেন। এক ওড়িয়া ভক্তের যোগশিক্ষা করার ইচ্ছে হল। কিন্তু তিনি নিজে বাবার কাছে সে কথা বলতে সাহস করছিলেন না। তিনি হেরম্বনাথকে ধরলেন। বললেন, আপনি বাবাকে বুঝিয়ে রাজী করান। তিনি যেন আমাদের স্বরোদয় শিক্ষা দেন। এই যোগ শিক্ষা করলে জগতের অনেক বিষয় আমাদের জানা হবে। তা ছাড়া যোগশক্তি লাভ হলে সাধনায় উৎসাহ বাড়বে। হেরম্বনাথ ওড়িয়া ভক্তের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তিনি সুযোগ মতো দিগম্বর বাবাকে স্বরোদয় যোগশিক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

বাবা বললেন, বেশ তো, যাও আলমারি থেকে স্বরোদয় যোগের বই নিয়ে এস। দু'চারদিনের মধ্যে তোমাদের সব রহস্য শিখিয়ে দেব। এর সঙ্গে পরকায়া প্রবেশ বিদ্যাও শিখে নিতে পারো। তবে জেনে রেখো, এর দ্বারা তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যলাভ হবে না। বরং এই বিদ্যা তোমাদের আত্মজ্ঞানের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলতে পারি।

বাবার কথা শুনে হেরম্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে বাবা আমাদের আর স্বরোদয় যোগ শেখার দরকার নেই।

কি করলে ভক্তের কল্যাণ হয়, আর কি করলে তার অকল্যাণ হবে. তা দিগম্বর বাবা ভালোই বুঝতেন। তাই অনেক সময় কেউ খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়লেও তিনি কৃপাদৃষ্টি করতেন না। কারণ আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গল মনে হলেও ভবিষ্যতে তার মধ্যেই হয়ত মঙ্গলের বীজ লুকিয়ে থাকতে পরে। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভক্ত রামনন্দন মিশ্র রাজনীতি করতেন। তিনি প্রায়ই বাবার কাছে আশীর্বাদ নিতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুস্থানীয় এক শিক্ষিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও আসতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ওই ব্যক্তির অবস্থার অবনতি হয়। আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবই নষ্ট হয়ে যায়। লোকটির দূরবস্থা দেখে মিশ্রজীর খুব দুঃখ হল। তিনি তাঁর জন্যে বাবার কাছে আবেদন করলেন, বাবা যেন কৃপা করে তাঁকে দূরবস্থা থেকে রক্ষা করেন। সব শুনে দিগম্বর বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, ও তোমার বন্ধু হয়। তুমি নিশ্চয়ই তার মঙ্গল চাও?

—হ্যাঁ, বাবা তাই চাই।

—তবে মন দিয়ে শোনো আমার কথা। তোমার বন্ধুর হাতে টাকা এলেই সে বিষয়ের দিকে ঝুঁকবে। তাতে তাঁর ক্ষতি হবে। আর অভাবের মধ্যে থাকলেই ওর কল্যাণ হবে।

এবার মিশ্রজী সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন। আর কথা বাড়ালেন না। আসলে সাধারণ মানুষ কিসে নিজেদের মঙ্গল হবে, আর কি করলে অমঙ্গল হবে এসব বোঝে না। কিন্তু দিগম্বর বাবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, দ্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে কল্যাণ পথের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। আর তার জন্য যদি বর্তমানে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাও শ্রেয়। কারণ পরিণামে ভালো ফললাভ হয়। গীতায় বলা হয়েছে—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।। (গীতা ১৮।৩৭)

যা প্রথমে বিষের মতো মনে হলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় মনে হয়, আত্মবুদ্ধিপ্রসন্নতা জনিত সেই সুখকে সাত্বিক সুখ বলে।

সাত

প্রথম দিকে পুরীতে এসে দিগম্বর বাবা স্বর্গদ্বারের কাছে শ্মশানের এক পাশে পড়ে থাকতেন। তখন ব্রিট্রিশদের রাজত্বকাল চলছে। পুরীর কালেক্টর ছিলেন মিঃ আর্মস্ট্রং। একদিন বিকালে তিনি সমুদ্রতটে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। দিগম্বর বাবা বালির ওপর বসেছিলেন। ভক্তরা এসে দূর থেকে তাঁকে দর্শন করে প্রণাম করছিলেন। দিগম্বর বাবার দেহে কোনো আবরণই নেই। তাই দেখে সায়েব অবাক হলেন। একি এই সাধু

উলঙ্গ হয়ে সামাজিক স্থানে বসে আছে! বিদেশে কোনো খোলা জায়গায় উলঙ্গ অবস্থায় থাকা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া সমুদ্রতীরে অনেক বিদেশিনীও বেড়াতে আসেন। এখানে কোনো উলঙ্গ সাধু থাকলে তাঁদের পক্ষে সম্মানহানিকর হতে পারে। সুতরাং এই বেয়াদপি সহ্য করা যায় না। কালেক্টর সায়েব রক্ষীদের আদেশ দিলেন, উলঙ্গ সাধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলো। নাঙ্গা বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় রাখা হল।

জেলখানার ওপরে কালেক্টর সায়েবের অফিস। সায়েব জানলা দিয়ে দেখলেন নাঙ্গা বাবা জেলখানায় নেই। তিনি ছাদের ওপর রয়েছেন। একটু পরে দেখলেন নাঙ্গা বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। পরক্ষণেই দেখলেন তিনি যথারীতি ছাদের ওপর। একটু পরেই তিনি রাস্তায়। কালেক্টর সায়েব নাঙ্গা বাবাকে এই রকম যুগপৎ একবার অফিসের ছাদে, একবার রাস্তায় দেখতে পেলেন। এতে তিনি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। সায়েব বুঝতে পারলেন নাঙ্গা বাবা কোনো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি রয়েছে। তিনি আর দেরী করলেন না। নাঙ্গা বাবাকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন।

কালেক্টর সায়েবের ছেলে তখন আমেরিকায় থাকত। জেল থেকে বেরিয়ে নাঙ্গা বাবা সায়েবকে বললেন যে, বিদেশে তাঁর ছেলের একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেদিন রাতেই তিনি একটা টেলিগ্রাম পেলেন। তাতে জানা গেল পথ দুর্ঘটনায় তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

দিগম্বর বাবা ছিলেন অসাধারণ যোগবলের অধিকারী। কিন্তু এই জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী কখনও স্বেচ্ছায় তাঁর যোগবিভূতি প্রকাশ করতেন না। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে স্পষ্টবাদী শুষ্ক কঠোর প্রজ্ঞাবাদী সন্ন্যাসী মনে হলেও তাঁর অন্তর ছিল কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সাধারণ আর্ত-পীড়িত হতদরিদ্র মানুষদের দেখলে তিনি করুণায় বিগলিত হতেন। নিমেষে তাঁদের রোগ-ব্যাধির জ্বালা দূর করে দিতেন। দীনহীন অসহায় এই সব মানুষেরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলে মনে করতেন।

তখন দিগম্বর বাবা স্বর্গদ্বারের কাছে শ্মশানেই পড়ে থাকতেন। বেলাভূমিতে বালিরাশির ওপর তিনি বেশীর ভাগ সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে মৌন থাকতেন। মধুসূদন নামে এক দরিদ্র গোয়ালা শ্মশানের কাছে বাস করতেন। তাঁর একটি পুত্র ছিল। নাম বংশীধর। বংশী জন্মান্ধ। মধুসূদন ছেলের চোখ ভালো করার জন্য অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিন্তু কোনো ফললাভ হয়নি। মধুসূদন তাই বড় দুঃখী। এই অবস্থায়ও তিনি সাধুসেবার কথা ভুলে যাননি। তাঁর কাজ ছিল প্রতিদিন বিকালে একটি ভাঁড়ে করে দিগম্বর বাবার জন্য একটু দুধ নিয়ে আসা। স্বল্পাহারী বাবা দিনান্তে সামান্য দুধ বা ডাবের জল সেবা করতেন। তিনি মধুসূদনের সেবা গ্রহণ করতেন। মধুসূদন রোজই অন্ধপুত্রকে সঙ্গে করে আসতেন। বংশীধর এক জোড়া ফুলের মালা আনত বাবার জন্য। বাবাকে মালা পরিয়ে প্রণাম করত।

দিগম্বর বাবা বেশীর ভাগ সময়েই চক্ষু মুদিত করে রাখতেন। চোখ বন্ধ করেই ভক্তদের আশীর্বাদ দিতেন। মধুসূদন দিগম্বর বাবার একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। তাঁর বিশ্বাস দিগম্বর বাবা মানুষ নন, সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি একদিন বংশীকে শিখিয়ে দিলেন—আজ বাবাকে প্রণাম করার সময় বলবি, বাবা আমি চোখে দেখতে পাই না, আমি অন্ধ, তুমি দয়া করে আমায় ভালো করে দাও।

বংশী মনে মনে ঠিক করল সে তাই করবে। বিকালে যথারীতি বাবার গলায় মালা পরিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপর কেঁদে বলল, বাবা আমি অন্ধ, তাই বড় দুঃখী। তুমি ভগবান। একবার চোখ খুলে আমাকে দেখ। আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও বাবা।

ভক্তের ব্যাকুল ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলে। করুণাময় দিগম্বর বাবা ভক্তের কান্নায় যেন বিবশ হয়ে পড়লেন। একবার তার দিকে চোখ মেলে তাকালেন। বালক বংশীধর তখনও কেঁদে চলেছে। তার বেদনার অশ্রুতে বাবার অন্তরে করুণাধারা উন্মুক্ত হল। তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ বেটা, তুমি চোখ খোল। দেখ এখন তুমি অন্ধ নয়। তুমি এখন সবকিছুই দেখতে পাবে।

ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম স্বয়ং। ব্রহ্মবাক্য অমোঘ। ধ্রুব সত্য। তাই তাঁর কথাই সত্যি হল। বালক বংশীধর চোখ খুলল। বিস্ময়ে পুলকে বংশীধর তখন কাঁপছে। চীৎকার করে বলে উঠল, কি আনন্দ, কি সুন্দর, আমি এখন স্পষ্ট সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। তার দু'চোখ দিয়ে তখনো প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মাথার ওপর নীল আকাশ, সামনে তরঙ্গায়িত সমুদ্র। বালক বংশীধরের জীবনে এক মায়াময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এমন অদ্ভুত যোগবিভূতি দর্শন করে ভক্ত মধুসূদন গোয়ালা বাকরুদ্ধ হয়ে হয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বংশীধরের কান্না ও হাসির দুই উৎস যেন একসঙ্গে খুলে গেছে। দিগম্বর বাবা তাঁর প্রসাদী মালা একখানা বংশীকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন বাড়ী যাও। আগামী কাল আরোও ভালো মালা নিয়ে এস।

দিগম্বর বাবা যেন কারোর ঋণ রাখতেন না। মধুসূদন গোয়ালার দুধ সেবার বিনিময়ে তাঁর অন্ধ সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে সেদিন যাঁরা বাবার এই অলৌকিক দিব্য বিভূতির সাক্ষী ছিলেন তাঁরা ধন্য।

শ্রদ্ধেয় কুমুদবন্ধু সেন একটা ঘটনার কথা বলেছেন। দিগম্বর বাবা ভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় রোগা হাড়জিরজিরে একজন মানুষ এসে বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তিনি কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত। বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, কি খবর?

লোকটা কেঁদে ফেললেন। বললেন, বাবা আমি আর রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। আমার পেটে কিছুই সয় না। সামান্য দুধ-সাবুও হজম করতে পারি না। কিছু খেলেই পেট ব্যথা করে।

বাবা রাগত স্বরে বললেন, তা আমি কি করব। আমি কি ডাক্তার? যা ডাক্তারের কাছে যা। চিকিৎসা করা।

লোকটা মিনতি করে বললেন, অনেক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। কোনো ফল হয়নি। তাই আপনার শরণে এসেছি। একটু কৃপা করুন বাবা।

এ যে কালব্যাধি। আমি আর কি করব! চলে যা লোকনাথ শিবজীর মন্দিরে। শিবজীর চরণামৃত রোজ এক ঘটি করে খাবি। তোর রোগ সেরে যাবে। যা কোনো ভয় নেই, বুঝলি।

ভক্ত কুমুদবাবু এবার হাসিমুখে বললেন, বাবা আপনি একটু আগে বললেন, সিদ্ধাই দ্বারা রোগ সারানো ভালো নয়। এখন আপনিও তো সেই কথাই বললেন।

শুনে দিগম্বর বাবা হাসিমুখে বললেন, দ্রব্যগুণ তো মানতেই হবে। দেখো, শিবজীর মাথায় লোকে কত কি জিনিস দেয়, ডাব, জল, দুধ ঢালে। সে সব দ্রব্যের গুণেই পেটের রোগ চলে যেতে পারে।

দিগম্বর বাবা এইভাবে সুকৌশলে নিজের যোগবিভূতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। ভক্ত কুমুদবাবুর তা বুঝতে অসুবিধা হল না। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। এবার দিগম্বর বাবা সমুদ্র স্নানে গমন করলেন।

শ্রদ্ধেয়া মণিকা মিত্র 'শ্রীশ্রীদিগম্বর বাবা' গ্রন্থে বাবার এক অদ্ভুত দিব্য বিভূতির উল্লেখ করেছেন। একদিন বিকালের দিকে তিনি গির্ণারীবন্ত আশ্রমে গিয়েছেন। তিনি দিগম্বর বাবার চরণপ্রান্তে বসেছিলেন। ক্রমশ সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে সন্ধ্যা নেমে এল। ফেরার তাগিদ ছিল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বাবাকে তাঁর ভীতির কথা জানালেন। তিনি যে রিক্সায় এসেছিলেন সেটি দু'কিলোমিটার দূরে লোকনাথ শিবের মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করছে। তখন প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাবা সাধারণত বালিয়ারীর নীচে নামেন না। কিন্তু মণিকাদেবীর কথা শুনে তিনি তাঁর সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। সেখানে একটা স্বাস্থ্যবতী গাভী চরছিল। দিগম্বর বাবা তাঁকে বললেন, যাও এই গাভী তোমার পিছনে যাবে, কোনো ভয় নেই। আশ্চর্য, সেই গাভীটি শ্রদ্ধেয়া মণিকা মিত্রের পিছু পিছু লোকনাথ শিবের মন্দির পর্যন্ত হেঁটে এল। তারপর তিনি রিক্সায় উঠলে গাভীটি দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দেখল। যতক্ষণ তাঁর রিক্সা দেখা গেল ততক্ষণ গাভীটি সেদিকে তাকিয়ে রইল। সেদিন এমনি অলৌকিক-ভাবে বাবা প্রিয় শিষ্যাকে নির্ভয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

একজন স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই আসতেন দিগম্বর বাবার কাছে। লোকটিকে দেখলে মনে হত তিনি বড় দুঃখী। তিনি বিশেষ কারোর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেন না। চুপচাপ ঘরের একপাশে বসে থাকতেন। লোকটির স্ত্রী দূরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। তিনি বাবার কাছে তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাতেন। লোকটির কাতর প্রার্থনা শুনে বাবা বললেন, শোনো, যদি তুমি একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী অথবা আদর্শ গৃহীকে (যে সৎ, নিয়মনিষ্ঠ ও পরহিতকারী) আগামী অমাবস্যার আগে ভালো করে তৃপ্তি সহকারে সেবা করতে পারো, এবং নতুন বস্ত্র দান করতে পারো, তা হলে তোমার স্ত্রী কিছুকালের জন্য সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে. তা হল—সেই সন্ন্যাসী বা গৃহী যেন স্বেচ্ছায় তোমার দেওয়া অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করে। লোকটি তখনও তেমন একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী বা আদর্শ গৃহীর সন্ধান করতে পারেননি। পরের ঘটনা জানা যায়নি।

আট

সময়টা ১৯২০ সালের মাঝামাঝি হবে। শ্রদ্ধেয় কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় তখন উজ্জীবন পত্রিকায় (ধর্মীয় পত্রিকা) লিখতেন। সেই সময়কার তোতাপুরী বাবার কথা তিনি 'পুরীধামে ন্যাংটা বাবা' শীর্ষক প্রবন্ধে (পৌষ সংখ্যা, ১৩৬৯) লিখেছিলেন। আমরা সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

তখন তোতাপুরী স্বামীকে সকলে দিগম্বর বাবা বা নাঙ্গা বাবা বলে জানতেন। তিনি তাঁর বিশাল দেহটি নিয়ে পুরীর সমুদ্রতটে বালির ওপর পড়ে থাকতেন। তিনি বেশীরভাগ সময় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কথাবার্তা বেশী বলতেন না। ভক্তরা এলে মাঝে মাঝে গীতা উপনিষদ ও বেদান্ত পাঠ করে শোনাতেন। আবার সহজ সরল ভাষায় তার ব্যাখ্যাও করতেন।

তখন পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট দয়ানিধি বাবুর কাছে সংবাদ গেল যে একজন বিশাল দেহী উলঙ্গ সন্ন্যাসী পুরীর সমুদ্রতটে দিন রাত বসে থাকেন। সকলে তাঁকে নাঙ্গাবাবা বলে ডাকেন। বাস্তবিক তিনি এমন দীর্ঘদেহী পুরুষ ছিলেন যে, তিনি বসে থাকলেও পাশের দাঁড়ানো মানুষটিকে তাঁর সমান উচ্চতাসম্পন্ন মনে হত। বাবা কাউকে চরণ স্পর্শ করতে দিতেন না। সকলে দূর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। দয়ানিধিবাবুর স্ত্রীও নাঙ্গা বাবাকে প্রণাম করতে আসতেন।

একদিন দয়ানিধিবাবু পুলিশ সুপার ও সেন মহাশয়কে নিয়ে সমুদ্রতীরে নাঙ্গা বাবাকে দর্শন করতে এলেন। বাবাকে প্রণাম করলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে বললেন, তোমার স্ত্রীও এসেছিল। ছেলে যাতে ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাই জানাতে। ছেলেটা তো পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে।

—সবটাই আপনার আশীর্বাদে হয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে দয়ানিধিবাবু জানালেন। আরো বললেন. সে কয়েকদিনের মধ্যে পুরীতে আসছে। তারপর বিলেত যাবে সিভিল সার্ভিস (Civil Service) পরীক্ষা দেবার জন্য।

নাঙ্গা বাবার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি কেমন মৌন হয়ে গেলেন। ছেলে কলকাতা থেকে এলে তিনি স্ত্রী-পুত্র সহ নাঙ্গা বাবাকে প্রণাম করতে এলেন। বাবাকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, বাবা, ছেলে পাঁচদিন পর বিলেত যাবে। আপনি ওর মাথায় আশীর্বাদ দিন।

—আগে চারদিন যাক, তারপর এস। বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন। কিছু একটা গোপন রহস্য রয়ে গেল। তৃতীয়দিন রাতে ছেলেটি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং চতুর্থ দিনে মারা গেল। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে গেল যা কল্পনাতীত। খবর চারদিকে প্রচার হয়ে গেল এবং নাঙ্গা বাবার দিব্যবিভূতিও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

নাঙ্গা বাবা সারাদিন প্রায় উপবাসে থাকতেন। দিনান্তে একটা ডাব ও কিছু দুধ সেবা করতেন। এরপর কিছুদিন আর নাঙ্গা বাবাকে দেখা যায়নি। জানা গেছে সে সময়ে তিনি সাক্ষীগোপালের স্থানে গমন করেছিলেন। কয়েকজন ভক্ত তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁদের একজনের কাছে কুমুদবাবু জানতে পরেন,

সেখানে বাবা জঙ্গলে বাস করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তবে ভক্তরা ইচ্ছে করলে ডালপালা দিয়ে কুটির বানিয়ে থাকতে পারেন।

দর্শনার্থী ভক্তরা নাঙ্গা বাবাকে প্রণামী ও অন্যান্য জিনিস দিতেন। তিনি সে সব স্পর্শ করতেন না। সেবককে সেসব কুটিরে রাখতে বলতেন। তা দিয়ে ভক্তদের সেবা করাতে বলতেন। নাঙ্গা বাবার সেই সেবকটি ছিলেন সাক্ষীগোপালের একজন পূজারী। এরপর নাঙ্গা বাবা গর্জারের দিকে যাত্রা করেন। তখন ওই সেবকটি তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। বললেন, বাবা আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

—তুমি কি আমার মতো কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব বাবা। আপনার কাছে থাকলে যে আনন্দ পাই তাতে উপোসী থাকলেও আমার কোনো কষ্ট হবে না।

সেই ব্রাহ্মণ নাঙ্গা বাবার কাছে বসে গীতা উপনিষদ ইত্যাদি পাঠ করে শোনাতেন। বাবা তাতে সন্তোষ লাভ করতেন। স্বেচ্ছাবিহারী নাঙ্গা বাবার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। প্রায় বছর খানেক এই রকম লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে নির্জনবাসে কাটালেন। তারপর আবার পুরী ফিরে এলেন। এবার তিনি লোকনাথ শিবের মন্দির থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে একটা পুরনো বালিয়াড়ী ঢিবির ওপর থাকতেন। পরে সেখানেই তিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

কুমুদবাবু একদিন নাঙ্গা বাবার দর্শনে যান। তখন গ্রীষ্মকাল। সকাল ১০টা বাজে। প্রচণ্ড রোদে বালি যেন তেতে আগুন হয়ে আছে। সেন মহাশয় জুতো পায়ে দিলেও পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। কী আশ্চর্য! এত উত্তপ্ত বালিরাশির ওপর নাঙ্গা বাবা আধশোয়া অবস্থায় সুখাসনে উপবেশন করছেন। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ অষ্টপাশ মুক্ত সন্ন্যাসী নাঙ্গা বাবার পক্ষে এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। গীতায় পরমযোগীর লক্ষণের বর্ণনায় বলা হয়েছে —

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়ো।। (গীতা ৬।৭)

অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জয় করেছেন, যাঁর ইন্দ্রিয় সংযত এবং চিত্ত প্রশান্ত, তাঁর মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে। তিনি শীত গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মানাপমানে স্থিরবুদ্ধি হয়ে থাকেন।

কুমুদবন্ধু সেন দেখলেন সাক্ষীগোপালের সেই ব্রাহ্মণ, যিনি এখন বাবার সেবক কাছেই একটা পাতার কুটিরে বাস করছেন। তিনি প্রথমে নাঙ্গা বাবাকে দর্শন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। বাবা বললেন, এই চড়া রোদে তুমি এলে কি করে? তারপর ব্রাহ্মণ সেবককে বললেন, একে একটা ডাব খেতে দাও।

বাইরে থেকে তাঁকে শুষ্ক সন্ন্যাসী বলে মনে হলেও নাঙ্গা বাবা ছিলেন সেবার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সেবার আদর্শ সকলের শিক্ষনীয়। ডাব খাবার পর তিনি এক বাটি দুধ আনতে বললেন। তাতে কি একটা পাতার রস মেশালেন। তারপর সেটি কুমুদবাবুকে সেবা করতে দিলেন। দুধের সরবৎ খেয়ে তিনি বেশ শীতল ও চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

নাঙ্গা বাবা বেশ খোস মেজাজে ছিলেন। ভক্ত কুমুদবাবু প্রশ্ন করলেন, বাবা ভগবান লাভ কিসে হয়?

—তুমি তো ব্রহ্মের কোলেই বসে আছ। আর তিনি তোমার হৃদয়াসনে বসে আছেন।

—একবারেই কি তা হয়? আপনার কত যোগ ও তপস্যা।

—সেসব করেই তো তোমাকে বলছি। কলিতে বাঙালীরা যোগ প্রাণায়াম করতে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন সিদ্ধাই এর দিকে ঝোঁক আসবে। আমি সবই করেছি।

—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথা বেদান্তে বলে।

—তোমার অতশত বড় বড় কথায় কি প্রয়োজন? যা বলছি তাই কর। সেটাই সহজ পথ। আগে ওসব ধারণা হোক, তখন বলবে। তোমার গুরুকরণ হয়েছে দেখছি। তা বেশ। গুরুপ্রদত্ত ইষ্ট নাম জপ করবে। ইষ্টই ব্রহ্ম জানবে। তুমি তাঁর কোলেই বসে আছ। তিনিই তোমাকে ব্রহ্মানন্দ দিতে পারেন।

—আপনি কখনো জগন্নাথ দর্শন করতে যান না?

—হৃদয় মন্দিরে দর্শনই প্রকৃত দর্শন। একবার এমার মঠে রথ দেখতে গিয়েছিলাম।

—কেমন দেখলেন?

—সেখানে চলছে মস্ত তামাশা। কি পান্ডা, কি পুলিশ যাত্রীদের যথেচ্ছ ঠকাচ্ছে। টাকা পয়সা নিচ্ছে। জোর জুলুম করছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরস্পরকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করছে। অনেকে জুতো পায়ে দিয়েই রথ টানছে। আর পুলিশরাও। তুমি রোজ জগন্নাথ মন্দিরে যাও?

—দিনে দু'বার যাই।

—কি দর্শন কর?

—শ্রীবিগ্রহমূর্তি।

—সেখানে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, রোগীদের দেখনা? অনেকে নানা মতলবে যায়। মন্দিরে সস্তায় প্রসাদ পাওয়া যায়। তাই অনেকে ওখানে প্রসাদ পেতে যায়।

—বাসুদেব বাবা বলে এক সাধু আছেন।

—আহা ওই একজন মহাত্মা আছেন। দেখবে কি তন্ময় ভাব। ও রকম দু'একজন কস্মিন কশ্চিৎ আসেন।

—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও জগন্নাথ দর্শন করে বাহ্যদশালুপ্ত হতেন। এমন কি জগন্নাথ কথাটাও পুরো উচ্চারণ করতে পারতেন না।

—মহাপ্রভুকে কি বুঝেছ? হাতির বাইরের দাঁত দেখে কি হাতি চেনা যায়? তিনি জগন্নাথ দর্শন করে অন্তরে ব্রহ্ম দর্শন করতেন। এক ব্রহ্মই সব হয়েছেন। এসব উচ্চস্তরের কথা। কিন্তু মন্দির নিয়ে ব্যবসা করা হেয় কাজ। তাদের মুক্তিলাভ কষ্টকর।

এরপর সেন মহাশয়কে নাঙ্গা বাবা বললেন, আর একটা ডাব খাও। সেবককে বললেন, আর একটা ডাব এনে দাও। তিনি বাবার আদেশ পালনে ইতস্তত করছেন। কারণ কুটিরে আর একটা ডাবই আছে। সেটা নাঙ্গা বাবার সেবার জন্য রাখা আছে।

জানতে পেরে কুমুদবাবু বললেন, সে কি বাবা, আপনার সেবার জন্য একটা মাত্র ডাব আছে। আমি আর ডাব খাব না।

নাঙ্গা বাবা একটু জোরের সঙ্গে বললেন, সেই ডাবটাই এনে দাও। আমাকে যিনি খাওয়াচ্ছেন, তিনিই যোগান দেবেন। তোমায় ভাবতে হবে না।

নাঙ্গা বাবার আদেশ পালন করা হল। আর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল বালিয়াড়ীর নীচে ডাববোঝাই একটা গরুর গাড়ী এসে হাজির। ডাবের মালিক এসে বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বললেন, আমার বাগানে অনেক নারকেল গাছ আছে। তার একটা গাছে আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম, এ গাছে প্রথম যা ফল হবে তা আপনার সেবায় পাঠাব। এখন আপনি দয়া করে এগুলো গ্রহণ করুন।

বাবা সেবককে ডাবগুলো রাখতে আদেশ করলেন। তারপর যিনি ডাব এনেছিলেন তাঁর প্রসাদের ব্যবস্থা করতে বললেন। সকলে এই অদ্ভুত যোগাযোগ দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন।

তিনি কুমুদবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলে তো, আমরা সকলে কেমন ব্রহ্মের কোলে বসে আছি। তিনি আমাদের সকলকে পালন পোষণ করছেন। আমাদের লালসা বেশী, আমরা অহংকারে মত্ত, তাই সব গোলমাল পাকিয়ে যায়। তাই আমাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ। আর যে তাঁর কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে তার কোনো কিছুরই অভাব হয় না। চাই অনন্য শরণাগতি আর নির্ভরতা।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (গীতা ৯।২২)

অনন্যচিত্ত হয়ে যাঁরা এক মনে আমারই চিন্তা করে, তাঁদের জীবিকা অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণ আমিই করে থাকি।

নাঙ্গা বাবা সর্বতোভাবে ব্রহ্মনির্ভর হয়ে থাকতেন।

গির্ণারবন্তে সবে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভক্ত দর্শনার্থীগণ আসতে শুরু করেছেন। সেই সময়কার একটা ঘটনা। তখন এখানে আটজন শুয়োর পালক থাকত। তাদের প্রায় দু'শো শুয়োর ছিল। তারা জায়গাটাকে নোংরা করে রাখত। ফলে খুব দুর্গন্ধ ছড়াত। দিগম্বর বাবার ভক্তরা শুয়োর পালকদের ডেকে বললেন, দেখ ভাই এখানে দিগম্বর বাবা আশ্রম করেছেন। তিনি এই আশ্রমেই থাকেন। অনেক ভক্তরা তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে আসেন। তোমাদের শুয়োরগুলো জায়গাটায় ভীষণ নোংরা করে। বাজে গন্ধ ছড়ায়। এতে বাবার ও ভক্তদের বড় অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও ভালো হয়। উত্তরে লোকগুলো বলল, আমরা একশো বছর ধরে এখানে শুয়োর চাষ করছি। আমরা এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবো না। তোমরা সাধুবাবাকে এখান থেকে চলে যেতে বল। ভক্তরা খুবই দুঃখিত হলেন। তাঁরা সব কথা দিগম্বর বাবাকে জানালেন। বাবা মুখে কিছুই বললেন না। তারপর একদিন রাত দু'টোর সময় দেখল তারা একটা খোলা জায়গায় ঘুমাচ্ছে। সেই স্থানটি হল হরাচণ্ডীর মোহনা যেখানে নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গির্ণারবন্ত বালিয়াড়ী থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। শুয়োর পালকরা জানতে পারল না কি করে তারা শুয়োরের পাল নিয়ে হঠাৎ এত দূরে চলে এল। এরপর তারা আর কখনো গির্ণারবন্তে ফিরে আসার চেষ্টা করেনি।

নয়

জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী দিগম্বর বাবা বাহ্যিক পূজা আরতি অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিতেন না। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও ভক্তদের আবদার অনেক সময় মেনে নিতেন। তিনি জানতেন আড়ম্বরে পূজা অর্চনা করলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তবে ভক্তের অন্তরের আকুলতা ও ভক্তিকে তিনি কখনো উপেক্ষা করতেন না। তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল বাবার পূজা ও আরতি।

পুরীর জমিদারের পত্নী তুলসী দেবী ছিলেন দিগম্বর বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। গির্ণারীবন্তে আশ্রম নির্মাণের আগেই তিনি বাবার চরণাশ্রিত হয়েছিলেন। তিনি বাবার স্নেহধন্যা ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল প্রতিদিন সকালে বাবার দর্শনে আসা। সঙ্গে আনতেন একপাত্র দুধ এবং পূজার নানা উপাচার। তিনি বাবাকে আসনে পূজা করতেন। পূজা শেষে ধুনুচি পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে বাবার আরতি করতেন। সকালের নির্মল পরিবেশে ধূপধূনোর গন্ধে ঘরটিতে যেন এক দিব্য আবহ সৃষ্টি হত। দিগম্বর বাবাও কিছু বলতেন না। বালগোপালের মতো বসে থাকতেন। বাবা যেন গীতায় উক্ত 'অহং ভক্ত পরাধীনো'কথাটির প্রকট মূর্তি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলত ভক্তিমতী তুলসীদেবীর পূজা ও মঙ্গলারতি। আরতি শেষ হলে দিগম্বর বাবা দর্শনার্থীদের কথাবার্তা শুনতেন।

স্বেচ্ছাবিহারী বাবা হঠাৎ পুরীধাম ত্যাগ করে কোথাও গমন করতেন। সেবক বা ভক্তদের কাউকে কিছু বলতেন না। আবার কিছুকাল পরে আপন ইচ্ছায় গির্ণারীবন্তে ফিরে আসতেন।

এমনি একবার দিগম্বর বাবা হঠাৎ পুরীধাম ছেড়ে কোথাও যাত্রা করলে ভক্তিমতী তুলসীদেবী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি সংকল্প করলেন যতদিন না বাবা আশ্রমে ফিরছেন ততদনি তিনি অন্নজল কিছুই গ্রহণ করবেন না। কারোর কথায় তিনি সংকল্পচ্যুত হলেন না। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তুলসীদেবী যেন ব্রতধারিণী (সন্ন্যাসিনী) তপস্বিনী। জমিদারবাবু প্রথমে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, পরে তিনিও দিগম্বর বাবার ওপর সব ভার ছেড়ে দিলেন। প্রায় দু'বছর হতে চলল দিগম্বর বাবার কোনো সন্ধান নেই।

পরে ভক্তরা জানতে পারলেন বাবা ভাগলপুরের কাছে এক নির্জন জঙ্গলে অবস্থান করছেন। জমিদারবাবু লোকজন নিয়ে সেখানে গিয়ে বাবার শরণ নিলেন। বাবাকে জানালেন স্ত্রী তুলসীদেবীর অদ্ভুত প্রায়োপবেশনের কথা। অন্তর্যামী দিগম্বর বাবা নিশ্চয়ই ভক্তিমতীর এই সংকল্পের বিষয় জানতেন এবং তাঁরই অহৈতুকী অনুগ্রহে তুলসীদেবী কঠিন অনশন ব্রতে এতকাল জীবিত ছিলেন। এবার তাঁর হৃদয় গলে গেল। তিনি তখনই পুরীতে ফিরে এলেন। সোজা চলে গেলেন জমিদারের বাড়িতে। অনেকদিন পরে নিজের

বাড়ীতে বাবাকে দেখে তুলসীদেবী লুটিয়ে প্রণাম করলেন। যেন পিতা ও কন্যার মান-অভিমানের পালা চলছে। বাবা সস্নেহে বললনে, কি ব্যাপার। খানা-পিনা সব একেবারে ছেড়ে দিয়েছ। যাও শিগগির খাওয়া-দাওয়া করো। এদিকে এতদিন যে কেটে গেল তা যেন কিছুই বোধ হল না। মনে হল সামান্য দু' একদিনের ব্যাপার। তুলসীদেবী এবার বাবার আদেশ পালনে যত্নবান হলেন।

তুলসীদেবীর পূজা ও আরতি দেখে আরোও কয়েকজন ভক্ত পূজার উপকরণ নিয়ে বাবাকে পূজা ও আরতি করতেন। এই অনুষ্ঠানটি আশ্রমবাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন আশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসী শঙ্করানন্দ (ডাকনাম ছিল ভজুবাবু) ঠিক করলেন বাবার পূজা ও আরতি হবে আশ্রমের রোজকার এক অনুষ্ঠান।

দিনান্তে সূর্য পাটে বসলে গির্ণারীবন্তে গোধূলির কনে দেখা আলো ছড়িয়ে পড়ে। বালুতটে লাল আবির চিক চিক করে। সমুদ্রের ধীর তরঙ্গ ক্রমশ গম্ভীর হয়। শিবকল্প মহাকায় দিগম্বর বাবা নিজের বিশ্রাম ঘরে বসে থাকেন। উদাস দৃষ্টি মেলে ধরেন বাইরের দিকে। ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আশ্রমবাসীরা পূজারতির অর্ঘ্য সাজিয়ে আনেন। ধূপ, দীপ, পঞ্চপ্রদীপ, ধুনুচি, চামর, ফুল, মালা, কাঁসি, শিঙ্গা, ঘন্টা আরোও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সকলে জড়ো হয় নিভৃত কক্ষে। বাবার জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় সন্ধ্যারতি।

কিছুক্ষণ আরতি চলার পরই বাবা বলতে থাকেন, ভজু তাড়াতাড়ি সারো। সব ভূতেদের এখান থেকে ভাগাও।

—বাবা ভূত বলছেন কেন? আমরা আপনার আরতির জন্য এই সব বাদ্যযন্ত্র এনেছি।

—ভূত নয়ত কি বলব? এত হল্লা কিসের? আসল পূজা মনে মনে করতে হয়। আসল পূজা ধ্যান। এতো বাজনা বাজিয়ে তো ভূত তাড়ানোর মতোই হল।

দিগম্বর বাবার হাল্কা রসিকতা শুনে শঙ্করানন্দ মুচকি হাসলেন।

আর একবার কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয় সাধু গির্ণারীবন্তে এসেছিলেন। তাঁরা দিগম্বর বাবাকে শিবকল্প মহাপুরুষ জ্ঞানে পূজা ও অর্চনা শুরু করেন। তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে বাবার স্তব-স্তুতি-বন্দনা করতে থাকেন। তারপর নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কীর্তন করে বাবাকে আরতি করতে লাগলেন। দিগম্বর বাবা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, আরে এত হল্লা করে কি হবে? মনে মনে স্মরণ মনন করো। সেটাই হবে আসল ভজন। বাবার কথা সাধুদের উৎসাহে জল ঢেলে দিল।

দশ

বিহারের ভাগলপুরে এক গ্রামে দিগম্বর বাবা দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। সেখানে একটা ছোট আশ্রম করেছিলেন। আশ্রমের পাশ দিয়েই বয়ে যেত পুণ্যতোয়া গঙ্গা। গঙ্গা এখানে খুব একটা প্রশস্ত নয়, কিন্তু প্রবল খরস্রোতা। এমনি প্রবল বেগ যে, মনে হয় সামনে পাহাড়-পর্বত পড়লে তাকে চূর্ণ করে ফেলবে। গ্রামে গরীব চাষীদের বাস। তারা জমিতে চাষ করত। জমির ফসলেই কোনো রকমে দিন কাটাত। সুতরাং জমিই তাদের একমাত্র অন্নদাতা। নদীর পাড়ে কুটির বেঁধে যে সব চাষীরা পরিবার নিয়ে থাকত তারা ভাবল গঙ্গা যদি গতিপথ পরিবর্তন করে তাদের জমিজমা গ্রাস করে নেয় তবে তাদের ঘরবাড়ীও সব ভেসে যাবে। তখন গ্রামের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত করল তারা নাঙ্গা বাবার আশ্রমে যাবে। তাদের বিশ্বাস নাঙ্গা বাবা নিশ্চই তাদের একটা উপায় করে দিতে পারবেন। একদিন সকালে গ্রামবাসীরা সকলে মিলে নাঙ্গা বাবার আশ্রমে এল। বাবাকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাল, বাবা, আমরা বড়ই গরীব। জমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। চাষবাস করে অতি কষ্টে আমাদের দিন কাটে। কিন্তু বাবা আমরা কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন গঙ্গা ক্ষেপে গিয়ে আমাদের ক্ষেতখামার কুঁড়েবাড়ি সব ভাসিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। এখানে গঙ্গার স্রোত বড়ই প্রবল। বাবা, আপনি কৃপা করে গঙ্গার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিন। আমাদের জমি ও জীবন রক্ষা করুন বাবা। নাঙ্গা বাবা স্বভাবতই মৌন থাকেন। খুব প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। তিনি গ্রামবাসীদের দুঃখের কথা শুনে গম্ভীর

হয়ে গেলেন। কোনো কথা বললেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, কয়েকদিন পর দেখা গেল গঙ্গা তার গতিপথ বদলে নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী হয়ে বইতে শুরু করেছে!

পুরাণ কাহিনীতে আছে মর্ত্যে অবতরণকালে গঙ্গা প্রবলবেগে জহ্নুমুনির সাধনস্থল প্লাবিত করে ফেলেছিল। মুনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে গঙ্গাকে পান করে ফেলেছিলেন। পরে দেবতাদের প্রার্থনায় জহ্নুমুনি গঙ্গাকে কান দিয়ে মুক্ত করে দেন। আর একালে দয়াল সন্ন্যাসী নাঙ্গা বাবা গঙ্গার যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দিয়ে গ্রামের দরিদ্র চাষীদের জীবন রক্ষা করলেন।

ভাগলপুর আশ্রমেরই আর একদিনের ঘটনা।

তখন বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। নাঙ্গা বাবা আশ্রমে অবস্থান করছেন। আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গা যথারীতি বয়ে চলেছে। খরস্রোতা গঙ্গা বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে বড়বড় ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে। এ সময় খেয়া পারাপার করা কঠিন। অতি সাহসী ও অভিজ্ঞ দু'একজন মাঝি ছাড়া এ সময় গঙ্গা পারাপার করা যায় না। নদীর ওপারের গ্রাম থেকে একজন গোয়ালা রোজ খেয়াপার হয়ে এপারে দুধ বিক্রি করতে আসত। একদিন গোয়ালাটি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ল। লোকটা তার স্ত্রীকে দুধ বিক্রি করতে পাঠাল। গোয়ালাবউ নৌকায় নদী পার হয়ে এপারে গ্রামে দুধ বিক্রি করতে এল। দুধ বিক্রি করতে করতে বেলা পড়ে এল। যখন সে নদীর ঘাটে এল দেখল একটাও খেয়া নেই। ভরা গঙ্গা হু হু করে বয়ে চলেছে। গোয়ালিনী এবার ভয় পেয়ে গেল। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল, কি করে নদী পার হবে। দু'একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করে জানল আজ আর নৌকা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জোয়ারের জল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সুতরাং নদীপার হওয়া অসম্ভব।

দয়ালু নাঙ্গা বাবা তখন গঙ্গার পাড়ে বসেছিলেন। গোয়ালিনী বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর কান্নার সুরে বলল, বাবা আমার বড় বিপদ। বাড়ীতে আমার স্বামী জ্বরে পড়ে আছে। আমি তার হয়ে এপারে দুধ বিক্রি করতে এসেছিলাম। এখন দেরী হয়ে গেছে। সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। সব নৌকা চলে গেছে। আর কোনো খেয়া নেই। আমার বাড়ী ফেরাটা খুব দরকার। আপনি দয়া করে একটা উপায় করে দিন বাবা। যদি ফিরতে না পারি অন্তত আজ রাতটুকু আপনার আশ্রমে থাকার অনুমতি দিন। তখন আশ্রমবাসীরা জানালেন, রাত্রে কোনো মহিলার আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা নেই। তাঁরা তাকে ফিরে যেতে বললেন। মহিলাটি তখন বাবার চরণে কেঁদে পড়ল, বাবা কি করে নদী পার হব। পার হবার কোনো উপায় নেই। অজানা কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে থাকার চেয়ে আশ্রমে রাত কাটানো বেশী নিরাপদ নয় কি? গোয়ালিনীর যুক্তি শুনে বাবা মুখ খুললেন, ভয় নেই; যাও গিয়ে দেখ গঙ্গায় কোনো জল নেই। যদি তুমি ওপারে যেতে না পার, তবে আজ আশ্রমেই রাত কাটাবে, চিন্তা নেই।

বাবার কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করে গোয়ালিনী দুধের খালি পাত্র নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেল। সব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বাবার কথাই সত্যি। কোথায় জল! গঙ্গা একেবারে যেন শুকিয়ে গেছে। এখন তো দিব্যি হেঁটে পার হওয়া যায়। নাঙ্গা বাবাকে মনে মনে স্মরণ করে সে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে গেল। পায়ে একটুও জল লাগল না। গোয়ালিনী যখন ওপারে ঘাটে গিয়ে পৌঁছল তখন এক মাঝি তাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কি করে নদী পার হলে? ঘাটে তো কোনো খেয়া ছিল না। গোয়লিনীর সোজা সাপটা উত্তর—কই নদীতে একটুও জল ছিল না। পায়ে হেঁটে পার হয়ে এসেছি।

এগারো

নাঙ্গা বাবার গির্ণারীবন্ত আশ্রমে গুটিকয় সেবক সন্ন্যাসী ও ভক্ত বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ। বলা বাহুল্য আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব সবই ছিল স্বামী জ্ঞানানন্দের ওপর। অন্যান্য আশ্রমবাসীগণ তাঁকেই নানা কাজে সাহায্য করতেন। সংসার ত্যাগ করে তিনি বাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাবার সেবাই তাঁর সাধনা ও তপস্যা। তিনি ছিলেন অসাধারণ কর্মী। কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর কর্মনিষ্ঠায় নাঙ্গা বাবা সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সরল ভাষায় বলতেন, জ্ঞানানন্দ আমাকে ছেড়ে

কোথাও যায় না। সব সময় আশ্রমে পড়ে থাকে। জ্ঞানানন্দের শরীর খুব একটা মজবুত ছিল না। কিন্তু তিনি শরীরের প্রতি নজর দিতেন না। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন। লক্ষ্মীবাজার থেকে নিজে সব কিছু বাজার করে আনতেন। বাবার জন্য নিজে হাতে চাপাটি বানাতেন। বাবাকে পঞ্চদশী বিবেক ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন। বাবার বিশ্রাম ঘরের বারান্দায় একটা পেতলের ঘন্টা ঝোলানো থাকত। কোনো কিছু দরকার পড়লে বাবা ঘন্টা বাজাতেন। অমনি স্বামী জ্ঞানানন্দ বাবার সামনে এসে উদয় হতেন। তখন বাবা তাঁকে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দিতেন।

একদিন আশ্রমে রাঁধুনি আসেনি। স্বামী জ্ঞানানন্দও অসুস্থ। সেদিন শ্রীমতী মণিকা মিত্র বাবার দর্শনে যান। স্বামীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তিনি বাবার সেবার জন্য চাপাটি করতে পারবেন কি না। তারপর স্বামীজির কাছে চাপাটি তৈরির কৌশল জেনে নিয়ে তিনি বাবার জন্য কয়েকখানা চাপাটি তৈরী করে দেন। নাঙ্গা বাবা তরমুজের সরবৎ ও নিমের সরবৎ পান করতেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ জঙ্গলে গিয়ে কচি কচি নিমপাতা সংগ্রহ করে এনে বাবার জন্য সরবৎ তৈরী করতেন। তিনি বাবার বিশ্রাম গৃহ ঝাঁট দিতেন, ধূলো পরিষ্কার করতেন। সব কিছুই করতেন অতি যত্ন সহকারে, সেবার ভাব নিয়ে। জ্ঞানানন্দ নিজে ছিলেন বাবা অন্ত প্রাণ। দিগম্বর বাবার মহাসমাধির পর কিছুদিনের মধ্যে জ্ঞানানন্দও দেহরক্ষা করেন।

একদিন পুরীর রাণীমা কয়েকজন লোক নিয়ে নাঙ্গা বাবাকে দর্শন করতে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন কয়েক ঝুড়ি ফল ও মিষ্টি। বাবা তাঁদের দেখে ধ্যানস্থ হলেন। একটু দূরে রাণীমা ও অন্যান্যরা বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা চোখ মেললেন। বাবার আশীর্বাদ নিয়ে রাণীমা চলে গেলেন। শ্রীমতী মণিকা মিত্র সামনে বসে ছিলেন। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, বাবা, এই ফলগুলো কে খাবে? বাবা বললেন, আমি খাই না। জ্ঞানানন্দের ছাউনির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ওরা নিয়ে যাবে।

শ্রদ্ধেয়া মণিকা মিত্র পূজার জন্য নাঙ্গা বাবার একটা আলোক-চিত্র (Photo) তোলার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বাবা কোনো কথার জবাব দিলেন না, মৌন রইলেন। তিনি বারবার ফটো তোলার জন্য বাবাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বাবার অনুমতি পাওয়া গেল না। মণিকাদিদি স্বামী জ্ঞানানন্দজীকে ধরলেন বাবাকে রাজী করানোর জন্য। এবারও কোনো সুফল পাওয়া গেল না। আরোও কিছুদিন পরে স্বামী জ্ঞানানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে মণিকা মিত্র একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে আশ্রমে হাজির হলেন। কিন্তু মুস্কিল হল কি করে বাবার অনুমতি পাওয়া যাবে। ভয়ে সংকোচে মণিকাদিদি বাবার কাছে গিয়ে ফটো তোলার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করতে লাগলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খোলা আকাশের নীচে বটবৃক্ষের কাছে বাবার আসন পাতলেন। বাবা ধীর পদে আসনে গিয়ে বসলেন। তখন মনে হল বাবা ফটো তোলাতে সম্মত হয়েছেন। ফটোগ্রাফার বাকী কাজটুকু সারলেন। তিনি তিন কপি ফটো দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নেগেটিভ প্লেটটাও দিয়েছিলেন। বাবাকে ফটো দেখানো হল এবং জ্ঞানানন্দও ফটো দেখলেন। তিনি নেগেটিভটা চেয়েছিলেন। মণিকা মিত্র Negative সহ দু'কপি ফটো দিলেন। একটা কপি নিজের কাছে রাখলেন। পরে সেই ফটো বড় করে বাঁধিয়ে উপাসনা গৃহে আসনে বসানো হয়। ফটোটি হল বাবার মাথার জটা দড়ির মতো পাগড়ি করে পাকানো। নাঙ্গা বাবার এই অতি জীয়ন্ত বিগ্রহখানি এখনো দর্শনার্থীদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

স্বামী জ্ঞানানন্দ দিগম্বর বাবার অনেক দিব্য বিভূতির সাক্ষী ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি কথা প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতেন। তিনি বলেন, নাঙ্গা বাবা ছিলেন সর্বশক্তিমান পুরুষ। তাঁর যোগবল ও বিভূতি অসাধারণ। তাঁর অসাধ্য কোনো কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছে করলে মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ ফিরিয়ে দিতেন। অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারতেন। দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্তকে মুহূর্তে সুস্থ করে তুলতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রিষড়ার জমিদার মুকুটধারীলালের সর্পদংশনে মৃত্যু ও বাবার কৃপায় পুনর্জীবনলাভের কাহিনী ও ভাওয়ালের রাজকুমারের পুনর্জীবনলাভ করার কাহিনী উল্লেখ করতেন। (গ্রন্থের যথাস্থানে কাহিনী দুটি উল্লেখ করা হয়েছে।)

নাঙ্গা বাবার বিষয়ে স্বামী জ্ঞানানন্দ বলতেন যে, বাবার মতো সন্ন্যাসী জগতে দুর্লভ। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি আরোও বলতেন যে, দিগম্বর বাবার মতো এমন স্বতন্ত্র মহাপুরুষের আবির্ভাব জগতে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁকে দর্শন করলেই এক দিব্য অনুভূতি হত। তাঁর কৃপাশীর্বাদ লাভ করতে পারলে অধ্যাত্ম জগতের চাবি খুলে যেত। তাঁর মতো ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ আচার্য জগতে দুর্লভ। জগতের জীবকে কৃপা করার জন্যেই তিনি জ্ঞানের প্রদীপ হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাবার উপদেশাবলী শুধু কিছু শব্দগুচ্ছ মাত্র নয় অথবা বাক্যের উচ্চারণ নয়, তাঁর প্রতিটি কথায় একটি দৈবশক্তি ক্রিয়া করত। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তাঁর কথায় যেন একটা শক্তির ঝলক ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর উপদেশ শুনে ভক্তরা প্রকৃত শান্তির পথের সন্ধান পেতেন।

স্বামী জ্ঞানানন্দ তাঁর একদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। তখন শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। আশ্রমবাসীরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ জ্ঞানানন্দ হঠাৎ চীৎকার করতে লাগলেন.. চোর ...চোর। নাঙ্গা বাবা ঘুমাতেন না। আত্মধ্যানে মগ্ন থাকতেন। চীৎকার শুনে তিনি স্বামী জ্ঞানানন্দকে ডাকলেন। জ্ঞানানন্দ বললেন, বাবা আশ্রমে চোর এসেছিল। সব জিনিসপত্র নিয়ে পালাল।

নির্বিকার চিত্তে নাঙ্গা বাবা বললেন, তাতে তোমার কি হয়েছে? তুমি চীৎকার করছ কেন? তোমার তো কিছু হয়নি? লোকটার হয়ত কিছু জিনিসের দরকার পড়েছিল তাই নিয়ে গেছে। তোমার কাজ হল বরং লোকটাকে সাহায্য করা। তুমি এক্ষুনি গিয়ে আলো দেখিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়ে এস। বাইরে বড় অন্ধকার। তার যেতে যাতে কষ্ট না হয়।

বাবা আরোও বললেন, জ্ঞানা তোমার চীৎকার করা মোটেই উচিৎ হয়নি। বরং সব জিনিস গুছিয়ে দিয়ে ওকে সাহায্য করার দরকার ছিল। যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয়। এই হল সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের কথা। এমন ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টিতে নিছক পাগলামি বা বোকামি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃত আত্মজ্ঞানীর সমদর্শিতা অসাধারণ। তিনি শত্রু-মিত্র, সাধু-অসাধু, উচ্চ-নীচ, সৎ-অসৎ কোনো ভেদাভেদ করেন না।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।। (গীতা ৬।২৯)

অর্থাৎ সমদর্শী যোগী আপনাকে সর্বজীবে সমান দেখেন। এবং আপন আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত ও সর্বভূতকে নিজ আত্মাতে সমানভাবে দেখেন।

স্বামী জ্ঞানানন্দ বলতেন, নাঙ্গা বাবা কখনো দিব্যবিভূতি প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন নিগমপন্থী। সর্বদা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতেন। বাবা ছিলেন সর্বপ্রকার প্রচারের বিরোধী। একবার এক সাংবাদিক ভক্ত তাঁর বিষয়ে কাগজে লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভীষণ রেগে যান। জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা হেতু মাঝে মাঝে তাঁর যোগবিভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ত। বাবা নিজের কথা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করতেন না। কেউ প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যেতেন। ফলে এই উদারচেতা মহাপুরুষের দিব্যজীবন ও অলৌকিক ঘটনাবলী চিরকাল জগতের মানুষের কাছে অজানা থেকে যাবে।

কথা প্রসঙ্গে স্বামী জ্ঞানানন্দ বলতেন এই গির্ণারীবন্ত আশ্রমে দিগম্বর বাবার অনেক দিব্য যোগ-বিভূতি প্রকাশ হয়েছে। আশ্রমবাসীদের অনেকেই সেই দিব্যলীলা-বিভূতি দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা বলেন বাবার যোগবিভূতির কোনো তুলনা হয় না। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। প্রতিদিন অনেক ভক্ত-দর্শনার্থী আশ্রমে আসতেন। তাঁরা বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেক মৃত ভক্তরাও আসতেন (তাঁরা জীবিতকালে বাবার ভক্ত ছিলেন)। এমনকি দিনের বেলাতেও অশরীরী ভক্তরা আসতেন। নাঙ্গা বাবা ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আবার অনেকদিন রাত্রিবেলায় দেখা যেত বাবার ঘর থেকে অদ্ভুত আলোকরশ্মি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানানন্দ বলতেন, আশ্রমে নানা সাধু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ আসতেন। তাঁদের মধ্যে শঙ্করের দশনামা পন্থী সন্ন্যাসীগণ যেমন ছিলেন, অবৈদান্তিক সন্ন্যাসীগণ এবং সন্ত কবীর-পন্থী সাধকবৃন্দও ছিলেন। উত্তর

ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তরাও বাবার কাছে আসতেন। নাঙ্গা বাবা সকলের সঙ্গে তাঁদের মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলতেন। অধ্যাত্মিক বিষয়ে অথবা শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাঁরা সকলেই সমৃদ্ধ হতেন। তাঁরা সকলেই নাঙ্গা বাবার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করতেন। বাবা তাঁদের আদর-যত্ন করার আদেশ দিতেন। একবার এক বিশেষ মুহূর্তে নাঙ্গা বাবা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে বলেন—আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বাইরে এক দূরাবগাহ অস্তিত্ব মাত্র।

অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমের আর একজন সন্ন্যাসী হলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। সকলে তাঁকে ভজুবাবু বলে ডাকতেন। তিনি ছিলেন প্রতিবন্ধী। হাঁটা চলা করতে পারতেন না। নাঙ্গা বাবার তিনি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। বাবা তাঁকে অনেক পরে সন্ন্যাস প্রদান করেছিলেন। তাঁকে বাবার সামনে এনে বসিয়ে দেওয়া হত। তিনি বাবাকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বাবার অনেক যোগবিভূতির কথা জানতেন। মাঝে মাঝে ভক্তদের কাছে দু'একটা ঘটনা বলতেন। আশ্রমে 'যমুনা মা' নামে আরেকজন সন্ন্যাসিনী থাকতেন। তিনি স্বামী শঙ্করানন্দকে নানা কাজে সাহায্য করতেন। যমুনা মা আমৃত্যু আশ্রমে বাস করেছেন।

স্বামী শঙ্করানন্দ বলতেন, বাবা হলেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। তিনি পরম ব্রহ্মের জীয়ন্ত বিগ্রহ। তাঁর মতো উচ্চকোটির সন্ন্যাসী হিমালয়ের নীচে খুব কম দেখা যায়। এ যুগে তাঁর মতো জ্ঞানমার্গের তপস্বী বিরল।

স্বামী শঙ্করানন্দ ছিলেন উদ্যোগী ও কর্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী। তিনি একবার বাবার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলেন নাঙ্গা বাবার একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাবার অতীত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। নাঙ্গা বাবা স্বয়ং তাঁর ফেলে আসা জীবনের বিষয় কিছুই প্রকাশ করতেন না। অতি রহস্যজনক ভাবে তিনি তাঁর স্মৃতি সম্পুটে গোপন করে রেখেছিলেন। আর তার সন্ধান পেতে হলে অবশ্যই দিগম্বর বাবার অহৈতুকী কৃপার প্রয়োজন। তিনি স্বেচ্ছায় কিছু তথ্য প্রকাশ না করলে তাঁর মহাজীবনের এক বিশেষ অধ্যায় বিস্মৃতির অতল গভীরে হারিয়ে যাবে। তাই শঙ্করানন্দ ও ভক্তবৃন্দ ঠিক করলেন সকলে মিলে বাবাকে চেপে ধরবেন। যদি তিনি মত বদলান এবং তাঁর অতীত জীবনের কিছু তথ্য কৃপা করে প্রকাশ করেন তবেই নাঙ্গা বাবার একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থের সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে। একদিন শঙ্করানন্দ কয়েকজনের সামনে নাঙ্গা বাবাকে বললেন, বাবা আমরা আপনার জীবনীগ্রন্থের সংকলন প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। আপনি দয়া করে আপনার অতীত জীবনের কিছু তথ্য জানান।

প্রস্তাব শুনে দিগম্বর বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, বেশ, তোমরা আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে জীবনী লিখতে চাইলে লিখতে পারো। তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তাঁরা বুঝতে পারলেন ব্রহ্মবিদ মহাত্মার দিব্য জীবনের প্রকৃত ইতিহাস লেখা সহজসাধ্য নয়। যা লেখা হবে তা শুধু কিছু দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্ত সেই মহাত্মার দিব্যবিভূতির বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনাবলী মাত্র। তাকে প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষের প্রামাণ্য জীবন-ইতিহাস বলা যাবে না। মহাত্মা যোগীর মহাজীবন ও জীবনচর্চার ভাব গভীর ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে তাঁর প্রকৃত জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, সংসারে থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। সুতরাং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী না হলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের প্রকৃত জীবনধারা জানা সম্ভব নয়। সম্ভবত বাবা তখনও তেমন কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সৎ একনিষ্ঠ ভক্ত জীবনীকারের সন্ধান পাননি। তাই তিনি তাঁর পূর্বাশ্রমের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে সরিয়ে রেখেছিলেন। এ ছাড়া আরোও একটা ব্যাপার থাকে। সাধুমহাত্মাদের যে জীবনী গ্রন্থ আমরা পাই তাতে তাঁদের লৌকিক জীবনের দিকটাই বেশী করে দেখানো হয়। তাঁর মহাজীবনের ভাবধারা, লক্ষ্য, আদর্শ, দর্শন, জীবনধারণের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তেমন কোনো সাধারণ জীবনীগ্রন্থ তো যেকোন সময় লেখা যেতে পারে। কিন্তু তাতে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সেই মহাপুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা জানার উপায় থাকে না। তাতে বরং সেই মহাজীবনের প্রতি

যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যদা দেখানো হয় না। সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটার ফলে প্রত্যবায় হতে পারে। সেই কারণে হয়ত মহাজ্ঞানী নাঙ্গা বাবাও তাঁর মহান জীবনকথা প্রকাশ করতে উৎসাহী ছিলেন না।

একবার এক ভক্ত নাঙ্গা বাবাকে তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে বাবা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু হয় না। আমার তো জন্মই হয়নি। বয়স বলব কি করে?

প্রকৃত ব্রহ্মবিদের কথা এমনই। বাস্তবিক তাঁরা সংসারে পদ্ম পত্রে জলের মতো অবস্থান করেন। তাঁরা এক নিস্তরঙ্গ অসীম অনন্ত ভূমানন্দে বিরাজ করেন। প্রাত্যহিক সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বিষাদের কোনো ঢেউ তাঁদের পরমসুখানুভূতির অবস্থাকে স্পর্শ করতে পারে না। সংসার জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর কাছে মায়া মাত্র। তত্বদর্শী নাঙ্গা বাবা তাঁর কথায় সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের পরমভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। বাবা জীবনের অন্তিম পর্বে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল গির্ণারীবন্ত আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। একান্ত নিভৃতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। খুব বেশী ভক্ত দর্শনার্থী সেখানে আসেন না। গুটি কয় সেবক সন্ন্যাসী ভক্তদের সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ করতেন। আর বেশীর ভাগ সময় আত্ম চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ থাকত না।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।। (গীতা ৯।৪)

অর্থাৎ অব্যক্তভাবে আমি জগতে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত বটে। কিন্তু আমি কিছুতেই স্থিত নই।

বারো

গোলক সাউ ছিলেন দিগম্বর বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি বাসুদেবপুরে বাস করতেন। পুরী থেকে বাসুদেবপুর একশো কুড়ি কিলোমিটার দূরে। গোলক সাউ এম. এ পরীক্ষায় পাশ করে এক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণে তাঁকে ওই পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তখন গোলক একটা ছোট ছাপাখানা খুললেন। ইংরেজী ভাষার বই ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতেন। এমন সময় নাঙ্গা বাবার এক ভক্ত তাঁকে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পরামর্শ দেন এবং তাঁর অবস্থার কথা বাবার কাছে নিবেদন করতে বলেন। গোলক সাউ নাঙ্গা বাবার অসাধারণ যোগবলের কথা শুনে ভাবলেন যে, বাবা যদি কৃপা করে তাঁকে ধনবান করে দেন। দিগম্বর বাবা সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি গোলকের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁকে আশ্রমে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। এরপরও যদি তিনি আশ্রমে ঢোকেন তবে লাঠিপেটা করবেন বলে হুঁশিয়ারী দিলেন। গোলক সাউও নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে রইলেন। পরে গোলকের নম্র শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যবহারে বাবার মন গলল। প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে বাবাকে যতই কঠোর শুষ্ক সন্ন্যাসী মনে হোক না কেন, আসলে তাঁর মনটি ছিল বড়ই কোমল। প্রথম দিন গোলককে দর্শন দান করে বললেন, যাও দর্শন হয়ে গেছে। এবার বাড়ী যাও।

গোলক নীরবে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু মনে মনে বাবার একজন গভীর ভক্ত হয়ে উঠলেন। বাড়ী গিয়ে গোলক এক অদ্ভুত কর্ম করলেন। খাতার পাতায় দিগম্বর বাবার নাম লিখে ভর্তি করতে লাগলেন। তারপর প্রতিদিন জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন। বাবার নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি যেন উন্মাদ হয়ে যেতেন।

কিছুকাল বাদে গোলক সাউ আবার গির্ণারীবন্ত আশ্রমে এলেন। দিগম্বর বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। বাবা এবার একেবারে অন্য মানুষ। গোলককে কিছু বললেন না। পরে তাঁকে ডেকে বাগানে কাজ করতে বললেন। তখন থেকেই গোলক অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে থেকে যান এবং প্রতিদিন বাগান চর্যা করতেন।

একদিন বাবা গোলককে ডেকে বললেন, বাগানে গিয়ে কিছু খাবার মতো কাজুবাদাম নিয়ে এস তো। তখন কাজুবাদামের সময় নয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে কাজুবাদামের ফল পাকে। কিন্তু তখন ছিল

শীতকাল। গোলক চিন্তায় পড়লেন। কিন্তু বাবার আদেশ শিরোধার্য করে বাগানে গিয়ে কাজু খুঁজতে লাগলেন। সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গোলক কোথাও একটা কাজুবাদাম পেলেন না। ক্লান্ত হয়ে পুকুর পাড়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তারপর বাবার কাছে ফিরে গেলেন। তাঁর অনুসন্ধানের কথা সব বললেন। এবার দিগম্বর বাবা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, গোলক আবার যাও ভালো করে খুঁজে দেখ। মন দিয়ে খোঁজনি তাই পাওনি। গোলক সাউ আবার বাগানে গেলেন। প্রতিটি কাজুবাদামের গাছ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজতে লাগলেন। এবারও কোনো কাজু দেখতে পেলেন না। পরন্তু ক্লান্ত হয়ে পুকুরের পাড়ে এসে বসলেন। ঠিক সেই সময় দেখলেন অদূরে একটা গাছ পাকা কাজুবাদামে ভর্তি হয়ে আছে। অসময়ে এতো পাকা কাজু দেখে গোলক আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। এ নিশ্চয়ই দিগম্বর বাবার কৃপা। গোলক সাউ বৃদ্ধ হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরিশ্রম করে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন। তিনি কুড়ি ত্রিশটা বাদাম তুলে খেয়ে ক্ষুধা দূর করলেন। তারপর পুকুরে স্নান করলেন। এরপর শুদ্ধ হয়ে আরোও কিছু কাজুবাদাম তুলে গামছায় বেঁধে বাবার কাছে নিয়ে এলেন। বাবাকে বাদাম নিবেদন করলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা গোলক সাউর জীবনে অগে কখনো ঘটেনি।

ভক্ত গোলক সাউ আরও একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

তখন চৈত্র মাস। বসন্তের শেষ। ঠাণ্ডা মোটেই নেই। বরং গরম পড়তে শুরু করেছে। ফুল ফোটার সময় শেষ। বাগানে আর ফুলের বাহার নেই। রকমারি ফুলের গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। গাঁদাফুলের গাছগুলোও সব শুকিয়ে আসছে। ডালে আর কুঁড়ি ধরে না। গোলক সাউ এবার বাগান পরিষ্কারের কাজে হাত লাগালেন। প্রায় মরে যাওয়া ফুলের গাছগুলো মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে আরম্ভ করলেন। উদ্দেশ্য সেই জায়গায় নতুন ফুলের চারা লাগাবেন। তিনি সকালে বাগানে কাজ করছেন। এমন সময় হঠাৎ দিগম্বর বাবা সেখানে এসে হাজির। বললেন, গোলক, তুমি ফুলগাছগুলো তুলে ফেলছ কেন?

গোলক বিনয়ের সুরে বললেন, বাবা আমি শুকনো গাছগুলো তুলে ফেলছি। সেখানে নতুন চারা লাগাবার জন্য।

বাবা বললেন, তার দরকার নেই। তুমি যে গাছগুলো তুলে ফেলছ, সেগুলো আগের ঠিক ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দাও।

বাবার এমন অদ্ভুত আদেশ শুনে গোলক একটু অবাক হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কারণ, শাস্ত্রে আছে 'গুরুবাক্য হ্যবিচারনীয়া'। অর্থাৎ গুরুর আজ্ঞা বিচার করতে নেই। অবিচারে তা পালন করতে হয়।

বুদ্ধিমান গোলকচন্দ্র পরক্ষণেই বাবার আদেশ পালন করলেন। এরপর সপ্তাহ কয়েক পরেই গাছগুলো আবার সতেজ হয়ে উঠল। আর তাদের ডালগুলিতে নতুন করে ফুল ফুটতে লাগল! মনে হল বাবার কৃপায় ফুলগাছগুলো যেন নতুন জীবন লাভ করে খুশিতে ঝলমল করতে লাগল। এরপর ১৯৬১ সালে দিগম্বর বাবার মহাপ্রয়াণের পর তাঁর দেহ এখানে সমাধিস্থ করা হয়। এখন সেখানে সুন্দর মহাসমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

দিগম্বর বাবা প্রতিদিন কূয়োর জলে স্নান করতেন। প্রতিদিন তাঁর স্নানের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল লাগত। ভক্তরা অনেকেই জল তুলতেন। একদিন গোলকচন্দ্র কূয়ো থেকে স্নানের জল তুলছিলেন। তিনি সেদিন একশো কুড়ি বালতি জল তুলেছিলেন। কিন্তু এরপরেও বাবার স্নানের জল প্রয়োজন হল। এদিকে এত বালতি জল তোলার জন্য স্বাভাবিকভাবেই গোলকচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি হঠাৎ মন্তব্য করে ফেললেন, যথেষ্ট পরিমাণে জল তোলা হয়েছে। দিগম্বর বাবা সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে বসেছিলেন। সেখান থেকেই গোলকচন্দ্রের কথা শুনতে পেলেন। তক্ষুণি বলে উঠলেন, আর জল তোলার দরকার নেই।

গোলকচন্দ্র সাউ আর একটা ঘটনার কথা বলেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। আশ্রমে একটা বড় চৌবাচ্চা ছিল। সেটা জলে ভর্তি করা ছিল। বিকাল তিনটের সময় দিগম্বর বাবা চৌবাচ্চায় নামলেন। আর একঘন্টা সময়

জলে অবস্থান করলেন। এক মহিলা ভক্ত বাবাকে দর্শন করতে এলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই বাবা রেগে বলে উঠলেন, যাও শিগগির এখান থেকে চলে যাও। বলতে বলতে তিনি নিজের জটা থেকে একগাছি চুল ছিড়ে নিয়ে মহিলাটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ভক্তটি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আরো কিছুদিন পর ওই মহিলা আবার আশ্রমে এলেন। বাবা আগে জানতে পেরেছিলেন। তিনি সেবক ভক্তদের বললেন, ওই মহিলা ভক্তকে আর আশ্রমে প্রবেশ করতে দিও না। কি কারণে তিনি ভক্ত মহিলাটিকে আশ্রমে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন না, তা একমাত্র তিনিই জানেন।

প্রতিদিন আশ্রমে দর্শনার্থী ভক্তরা প্রচুর ফুল মালা নিয়ে আসতেন। তা দেখে গোলক সাউ আশ্রমে খুব সুন্দর একটা ফুলের বাগান তৈরী করেছিলেন। সেখানে নানারঙের সুন্দর গোলাপ ফুটে থাকত। একদিন গোলকের ইচ্ছা হল বাবাকে একটা ফুল উৎসর্গ করবেন। তিনি বাগান থেকে একটা হলুদ রঙের গোলাপ তুলে এনে বাবার চরণে রেখে প্রণাম করলেন। ওমনি বাবা হঠাৎ রেগে গেলেন। রাগতস্বরে গোলককে বললেন, ফুল গাছে ফুটে থাকলে তা সুন্দর দেখায়। তুমি গাছ থেকে ফুল তুলে এনে আমার পায়ে রাখলে কেন? বাবার এমন রাগ হবে গোলকের ধারণা ছিল না। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। এরপর থেকে আর কখনো তিনি এমন ভুল করেননি। দিগম্বর বাবার কোনো কাজের কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। হয়ত বা এমন হতে পারে একদিন বাবার পায়ে ফুল দিলে প্রতিদিন ফুল দিয়ে চরণে প্রণাম করা গোলকের একটা অভ্যেস হয়ে যাবে। আর এইভাবে ফুল তুলতে তুলতে বাগানের শোভা নষ্ট হতে পারে, সেই কারণে বাবা রাগ প্রকাশ করেছিলেন।

একদিন এক ভক্ত আশ্রমে এসে দিগম্বর বাবাকে একটা সুন্দর মালা দিলেন। গলায় মালা পরে বাবা বললেন, ''আমাকে এমন কিছু নিবেদন করো যা একান্ত তোমারই।'' অর্থাৎ বাবা মনের কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, 'সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রণাম করো। শুধু রক্তমাংস দিয়ে গড়া এই দেহকে প্রণাম কোরো না।'

পুরীর বাশেমি সাহির এক ভক্ত একদিন দিগম্বর বাবার জন্য একটা মালা গাঁথছিলেন। তাঁর ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, মালা কার জন্য গাঁথছ? ভক্তটি বললেন—দিগম্বর বাবার জন্য। এই কথা শুনে বৃদ্ধা বললেন, একজন মানুষকে মালা পরিয়ে কি হবে মালাটা বরং মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেবকে দিয়ে এস।

কিন্তু ভক্তটি মালা গেঁথে বাবার আশ্রমে নিয়ে এলেন। দিগম্বর বাবা ভক্তটিকে বললেন, মালাটি জগন্নাথের মন্দিরে দিয়ে এস। একজন মানুষকে মালা পরিয়ে কি লাভ? ভক্তটি বাবার কথা শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। বস্তুত ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। কারণ ব্রহ্মবিদ স্বয়ং ব্রহ্মই। সর্বত্রই ব্রহ্মের হস্ত, পদ, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিস্তৃত। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।। (গীতা ১৩।১৪)

পুরী শহরের চারজন ছেলে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তারা সকলে মিলে বাবার আশ্রমে এল এবং বাবার সামনে গিয়ে বসল। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্যে এসেছ তোমরা? তারা বলল, আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। আমরা পরীক্ষার ফল জানতে চাই। বাবা বললেন, যাও, তুলসী হাতে নিয়ে আমার কাছে এস। তিনজন তুলসী পাতা নিয়ে এল। একজন তুলসী পাতা খুঁজে পেল না, সে খালি হাতে ফিরে এল। বাবা বললেন, যারা তুলসী হাতে নিয়ে এসেছ তারাই পাশ করবে। বাকী কজনের বিষয় কিছু বললেন না। পরীক্ষার ফল বেরুতে দেখা দেল, বাবার কথাই সত্য। এরপর সেই চারজনই বাবার খুব ভক্ত হয়ে গেল।

দিগম্বর তোতাপুরী বাবাকে ভক্তরা 'বাবা' 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বাবা বলতেন, শুধু 'বাবা' 'বাবা' উচ্চারণ করলেই হবে না। তোমাদেরও বাবা হতে হবে, চেষ্টা কর।

তিনি বলতেন, ভজন ও কীর্তন করা ভালো। কিন্তু জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্মরণ, মনন, সৎ আচরণ ভিন্ন আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতির আশা নেই।

ভক্তপ্রবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা মধুছন্দা ভট্টাচার্য 'শ্রীশ্রী দিগম্বর পরমহংস তোতাপুরী মহারাজ' গ্রন্থে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। হেরম্ব মুখোপাধ্যায় ছিলেন তোতাপুরী মহারাজের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। কিন্তু তিনি ওকালতি করেননি। অন্য ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন ঋষি অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য, অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। ব্যবসার খাতিরে তিনি বছরের বেশীর ভাগ সময় কলকাতার বাইরে কাটাতেন। সেই সুবাদে তিনি ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করতেন এবং সাধুসন্তগণের সঙ্গ করতেন। যোগীশ্বর শ্রীকালীপদ গুহরায় হেরম্বনাথকে পুরীতে তোতাপুরীর আশ্রমে নিয়ে যান। এরপর হেরম্বনাথ প্রায়ই পুরীতে আসতেন। বি. এন. আর হোটেলে উঠতেন। প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন সেরে তিনি রিক্সায় লোকনাথ শিবের মন্দির হয়ে তোতাপুরী মহারাজকে প্রণাম করতে যেতেন। তাঁর নিষ্ঠায় প্রীতিলাভ করে দিগম্বর বাবা তাঁকে গির্ণারীবন্ত আশ্রমে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে তিনি বাবার নির্দেশে তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ করে শোনাতেন। একবার তিনি পুরী থেকে ফিরে আবার হঠাৎ উধাও হয়ে যান। বাড়ীর সঙ্গেও কোন যোগাযোগ রাখতেন না। অবশ্য তিনি পরিবারের স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাদের প্রতিও যথারীতি কর্তব্য পালন করতেন। বাড়ীর সকলেই এই ব্যাপারটি মানিয়ে নিয়েছিলেন।

হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের দাদার স্ত্রীকে শ্রীমতী মধুছন্দা 'জেঠিমা' বলে ডাকতেন। জেঠিমার জামাইবাবুর নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি চন্দননগরের রেলস্টেশনে স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। একবার কি কারণে স্টেশনে আগুন লেগে যায়। তখন রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করে দেন। ফলে তিনি পরিবার- পরিজন নিয়ে খুব বিপদে পড়ে যান। সেই সময় কোনো এক জ্যোতিষী তাঁদের তীর্থ যাত্রা করার পরামর্শ দেন যাতে কোনো সাধুসন্তের কৃপায় তাঁরা বিপদমুক্ত হতে পারেন। তাঁরা অনেক তীর্থস্থান ঘুরে পুরী এলেন। কিন্তু কোনো সাধুমহাপুরুষের কৃপা না পাওয়ায় সাধুসন্তদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন সমুদ্রতটে একজন গেরুয়াধারী ভিখারী তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইলে তাঁরা রেগে গেলেন। বললেন, সাধুর বেশ ধরে ভিক্ষা করছ কেন? সাধু সেজে ঘুরতে লজ্জা করে না তোমার? গেরুয়াধারী ভিখারী বললে, আসল সাধু দেখতে চান? গির্ণারীবন্ত বালিয়াড়ীর ওপর উঠে যান। দেখবেন সেখানে তিনি বসে আছেন।

পরের দিন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বালীয়াড়ীর ওপর উঠে বাবা তোতাপুরী মহারাজের দর্শন পেলেন। দেখলেন দীর্ঘকায় শ্মশ্রুগুম্ভধারী জটাজুট সর্বাঙ্গে ভস্মাচ্ছাদিত এক দিগম্বর সন্ন্যাসী। সুখাসনে উপবিষ্ট। তাঁকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তাঁরা আরো দেখলেন সেখানে হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজের সামনে বসে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ করছেন। হেরম্বনাথকে সেখানে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। হেরম্বনাথ তাঁদের দেখে একটু হাসলেন। তখন দিগম্বর বাবা তাঁর হাসির কারণ জানতে চাইলেন। হেরম্বনাথ বাবাকে জানালেন যে তাঁর আত্মীয়রা এসেছেন। তাঁদের দেখেই তিনি হেসেছেন। দিগম্বর বাবা বললেন বেশ, তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ কর। আমি উঠছি।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী সব কথা হেরম্বনাথকে বললেন। তিনি বাবার কাছে তাঁদের কথা বলার জন্য হেরম্বনাথকে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিপদের কথা বাবাকে জানান।

তাঁরা দিগম্বর বাবাকে তাঁদের দুঃখের কথা জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন এবং বেশ কিছুদিন পুরীতে রয়ে গেলেন। রোজই তাঁরা বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করতে আসতেন। এরপর দিগম্বর বাবা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রীকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করলেন। দু-একদিন পরে তাঁদের বাড়ী ফিরতে আদেশ করলেন। চন্দননগরে ফিরে এসে ভোলানাথ বুঝতে পারলেন তাঁদের বিপদ কেটে গেছে। দিগম্বর বাবার কৃপায় তাঁর সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে যথারীতি চাকরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে। বাবার কৃপার কথা স্মরণ করে ভোলানাথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আগেই বলা হয়েছে দিগম্বর বাবা হেরম্বনাথকে আশ্রমে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় একবছর কাল আশ্রমে বাস করেন। সংসারের কোনো চিন্তা তাঁর ছিল না। সব কিছুই দিগম্বর বাবার ওপর ছেড়ে

দিয়েছিলেন। আশ্রমে থাকাকালীন প্রতিদিন সকালে স্নান করে তিনি বাবাকে প্রণাম করতে যেতেন। একদিন দেখলেন দিগম্বর বাবা বকুলগাছের তলায় বসে বকুলফুলের মালা গাঁথছেন। হেরম্বনাথ তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি হাতের বকুলমালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। বাবার হাতে বকুলফুলের মালা গলায় পরে হেরম্বনাথ ধন্য হলেন। বাবা বললেন, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। কারণ, তুমি আমায় অনেক আনন্দদান করেছ। তাই এই মালা দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। হেরম্বনাথ সেই বকুলফুলের মালাটি সযত্নে রক্ষা করতেন। কিন্তু দুঃখের কথা হল তোতাপুরী মহারাজের দেহাবসানের পর সেই মালাখানি আর পাওয়া যায়নি।

আশ্রমে থাকাকালীন হেরম্বনাথকে একটা ছেলে চা এনে খাওয়াত। দিগম্বর বাবা তা পছন্দ করতেন না। তিনি হেরম্বনাথকে ছেলেটির হাতে চা খেতে নিষেধ করলেন। কারণ হল, ছেলেটি আশ্রমের ফুল নিয়ে দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পয়সা নিত। বাবা তা মোটেই পছন্দ করতেন না। দিগম্বর বাবা হেরম্বনাথকে খবরের কাগজ পড়তে নিষেধ করতেন। কারণ তাতে মন বহির্মুখী হয়ে যায়। তিনি সর্বদা বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে পরামর্শ দিতেন। ভক্ত হেরম্বনাথ দিগম্বর বাবার কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের কথা ভেবে বাবা হেরম্বনাথকে সন্ন্যাস দিতে রাজী হননি।

ভক্ত হেরম্বনাথের কথায় অনেকেই পুরীতে দিগম্বর বাবাকে দর্শন করতে যেতেন। বিখ্যাত বাংলা চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসু হুইল চেয়ারে বসে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। ফরাসী মহিলা বি রোজনবার্গকেও হেরম্বনাথ দিগম্বর বাবার নিকট নিয়ে আসেন। সম্ভবত আলমোড়াতে হেরম্বনাথের সঙ্গে রোজেনবার্গের পরিচয় হয়েছিল। তিনি ভারততত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ভারতে আসেন।

দিগম্বর বাবা সাধারণত হিন্দি ভাষায় বাক্যালাপ করলেও সব ভাষাই জানতেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর সঙ্গে যে যে ভাষায় কথা বলতেন তিনিও তার সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা বলতেন। হেরম্বনাথের এক নিকট আত্মীয়ের নাম আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও গির্ণারীবন্ত আশ্রমে গিয়ে বাবা তোতাপুরী মহারাজকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। বাবাকে প্রণাম করলে, তিনি তাঁকে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ? বলা বাহুল্য আদিনাথও মাতৃভাষায় তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। সুতরাং বাবা যে শুধু হিন্দিভাষায় কথা বলতেন, একথা ঠিক নয়।

তের

নাঙ্গা বাবার উপদেশাবলী অমৃততুল্য। বিভিন্ন সময় শিষ্য ও ভক্তদের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করতেন সেই কথাগুলিই তাঁর চিরন্তনী মহাবাণী। গৃহী শিষ্যভক্তগণ এই শাশ্বত বাণী পাঠ ও শ্রবণ করে জীবনে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করলে শান্তিলাভ করবেন, সন্দেহ নেই।

অদ্বৈত বেদান্তবাদী বাবা বলতেন, এই কলিযুগে যদি কেউ যত্ন সহকারে বেদান্তের পথ অনুসরণ করে চলে তবে সে সহজেই ভবনদী পার হয়ে যেতে পারবে।

কেউ যদি সুখশান্তি চায় তাকে বেদান্ত শাস্ত্র অনুসরণ করতে হবে। আর নিজের প্রকৃত সত্তায় (আত্মতত্ত্বে) আশ্রয় নিতে হবে। তাকে বলে কল্পতরু যা সর্বসিদ্ধিদাতা। এ ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই।

তিনি প্রায়ই বলতেন, বেদান্ত এক অচ্ছিওয়ালা সেতু হ্যায়। ইসকা উপর দেকে এক চুটকি ভি নদী পার হো সকতা। বেদান্ত এমন এক চমৎকার সেতু যে এর ওপর দিয়ে একটা সামান্য পিঁপড়েও ভবনদী পার হয়ে যেতে পারে।

নাঙ্গা বাবা জ্ঞানমার্গের উপাসক হলেও ভক্তিমার্গের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন ভাবালুতাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, ধ্যানই প্রকৃত উপাসনা। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেখাই প্রকৃত দর্শন। যখন মনের মালিন্য দূর হয়, শুদ্ধতা আসে তখনই এই দর্শন হতে পারে। আর নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই মনের মলিনতা দূর করা যায়। তখন মন শুদ্ধ সত্ব হয়। কিন্তু আত্মোপলব্ধির জন্য একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান। তাই সর্বাগ্রে মনের শুদ্ধিকরণ দরকার। মন পবিত্র হলে সৎসঙ্গ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ

বাক্য শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে। একবার জ্ঞানসূর্যের উদয় হলে অজ্ঞানের (বা অবিদ্যার) অন্ধকার দূর হয়ে যায়। তখন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়।

বাবা বলেন, সৌভাগ্যবশত মনুষ্যদেহ লাভ হয়। এই জন্মেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দেবতারাও আত্মজ্ঞানলাভ করার জন্য মনুষ্য দেহলাভ করতে ইচ্ছা করেন। আত্মজ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমে ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। তা না হলে কী ভাবে আধ্যাত্মিক চেতনা আসতে পারে? তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের সখা ও সঙ্গী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিস্তারিতভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। তাঁকে বিশ্বরূপও দেখালেন। কিন্তু তাতে কি অর্জুনের আত্মজ্ঞান হয়েছিল? অর্জুন কি তা লাভ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন? যদি তিনি আত্মজ্ঞানলাভ করতেন, তবে পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে তিনি শোকে এত ব্যাকুল হতেন না। এটা হয়েছে অজ্ঞতার জন্য।

শুধু মানুষ নয় প্রাণীমাত্রেই সুখী হতে চায়। কিন্তু সুখলাভের পথ ছেড়ে দিয়ে সে ভুল পথ ধরে সুখলাভ করার চেষ্টা করে থাকে। পরিণামে কেউ সুখী হতে পারে না। বিনাশধর্মী পার্থিব বস্তু কখনো স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। বাহ্য জগৎ কি দৃশ্যজগতের কোনো বস্তুই স্থায়ী নয়। তা পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। তাই তা লাভ করে কখনো চিরসুখী হওয়া যায় না। বরং তা দুঃখেরই কারণ হয়। সকল পার্থিব ভোগই দুঃখ সৃষ্টি করে। অন্য দিকে মানুষ নিজেও পরিবর্তনশীল, বিনাশধর্মী ও স্বল্পায়ু। নিত্যই তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর মৃত্যু এসে তার ভোগলিপ্সার প্রচেষ্টাকে দূর করে দিচ্ছে। যদিও মৃত্যু এসে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর বিনাশশীল ও জড় তবুও সে কয়েকদিন শোকগ্রস্ত থেকে আবার সেই ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

প্রশ্ন : স্থায়ী সুখলাভের জন্য কি করা কর্তব্য?

উত্তর : স্থায়ী সুখ পেতে হলে প্রথমে সত্য বস্তু কি তা জানতে হবে। সত্য বস্তুকে জানার অর্থ তাকে লাভ করা। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাকে দেখার জন্য অন্য আলোর দরকার হয় না। দৃষ্টির অশুদ্ধতার জন্য সত্যদর্শন হয় না। দৃষ্টির দোষ প্রথমে দূর করতে হয়। তবে সত্যকে দর্শন করা সম্ভব। নিজের সম্বন্ধেও সত্যকে সন্ধান করতে হবে। নিজের সম্বন্ধে সত্য হল এই যে, বাহ্য ও দৃশ্যমান পদার্থই জড় এবং আমি অদৃশ্য ও চেতন। জড়পদার্থে অহং ভাবনা করলে তা নিজের মধ্যে উপলব্ধি হবে। আর চৈতন্যে অহং ভাবনা থাকলে সৎ চিৎ আনন্দ, যা চৈতন্যের স্বরূপ তার ভাবনা হবে।

প্রশ্ন : লোকে সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য আপনার কাছে আসে। তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি?

উত্তর : আত্মাকে জানাই সমস্ত কষ্ট দূর করার একমাত্র উপায়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন কোনো প্রকারে স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় না। যিনি সুখ বা আনন্দ পেতে ও দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, তিনি আত্ম কল্পতরুর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করুন। এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। শ্রুতিতে নানা পন্থার উল্লেখ আছে। বেদশাস্ত্র সম্মত পথই জীবের প্রকৃত সুখী হবার একমাত্র পথ।

প্রশ্ন : আত্মাকে কি ভাবে জানা যায়?

উত্তর : আত্মা সর্বস্থানে সবসময়েই প্রকাশমান। চিত্তের অশুদ্ধিতার জন্য আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না বা সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সূর্য সব স্থানে সমানভাবে কিরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কেবল স্বচ্ছ দর্পণ, স্বচ্ছ জল, শুদ্ধ বস্তুতেই তাঁর প্রকাশ ধরা পড়ে। অবিদ্যাজনিত দোষে চিত্তে মালিন্য, বিক্ষেপ বা আবরণরূপী ময়লা পড়ে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তা দূর করতে হয়।

প্রশ্ন : চিত্তশুদ্ধির জন্য কি যোগ সাধনার প্রয়োজন আছে?

উত্তর : চিত্তশুদ্ধিতে যোগসাধনা সাহায্য করে। কিন্তু একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই আত্মোপলব্ধি হয়—কর্ম দ্বারা নয়। কারণ কর্ম কর্তার অধীন। কিন্তু জ্ঞান বস্তুর অধীন। যেমন এটা একটা কাগজ, এই বোধ জন্মালে এ সম্বন্ধে আমার মত আর বদলাবে না। কিন্তু আমি কর্ম করতে পারি, আবার নাও করতে পারি। আমি সুকর্মও

করতে পারি। এই জন্য কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু আত্মপ্রাপ্তি বলতে নিজের স্বরূপকে জানা। জড় এবং চেতন এই দুই বস্তুর দ্বারা যে জগৎ তা অতি সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও জানা যায়। যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি জড় না চেতন, তবে অভিমানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই বলবে না যে আমি জড়। সুতরাং চৈতন্য বা চেতন আত্মাই হল, তোমার স্বরূপ। এই চৈতন্য আত্মাই সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তিনি অস্তি, ভাতি ও প্রিয়রূপে সর্বব্যাপী। তাঁকেই সামান্য চৈতন্য বলে।

প্রশান : বন্ধন ও মুক্তি কি?

উত্তর : সৃষ্টির আগে অহং প্রাদুর্ভাব। এই অহংভাব যখন আত্মার থাকে তখন মুক্তি। যখন ভুল ক্রমে প্রপঞ্চে হয়, তখন বদ্ধ। জীবদেহে অহংভাব আসায় মানুষ দুঃখী হয়েছে। সকলে প্রত্যক্ষ করেছে যে, মৃত্যুর পর শরীর পড়ে থাকলেও তাকে আর কেউ স্থান দিতে চায় না। সারা জীবনের এই প্রিয় শরীরকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। তারপর গোময় মাটি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করে নিজেকে আবর্জনা মুক্ত মনে করে।

যোগদা আশ্রমের এক আমেরিকান সাধু রিষড়া আশ্রমে নাঙ্গা বাবাকে প্রশ্ন করেন, দয়া করে বলুন অহংবোধ কি করে যায়? এখন এই শরীরে এই জন্মেই কি করে মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে?

বাবা উত্তরে বলেন, সাধনার দুটি পথ আছে। একটি হল এই জগৎকে স্বপ্নবৎ মনে করা অর্থাৎ মিথ্যা ভেবে চলা এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করা। অপরটি হল এই জগৎকে ভগবৎস্বরূপ ও ভগবৎময় মনে করা এবং নিষ্কাম কর্মে ব্রতী থাকা। এছাড়া অন্য উপায়ে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

প্রশ্ন : সাধনা কী রূপে করতে হয়?

উত্তর : এই জগৎকে স্বপ্নবৎ বোধ করা অদ্বৈত সাধনা এবং ভগবানের বোধ করা দ্বৈত সাধনা।

বাবার মতে চিত্তশুদ্ধির জন্যই সাধনা প্রয়োজন। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় স্বরূপপ্রাপ্তির জন্য কিছু করার নেই। সাধকের স্বরূপ তাই। ব্যতিক্রমে নিজেকে জীব বলে ভাবলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। অবিদ্যার কাজ হল—মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। মলকে নিষ্কাম শুভ কর্ম দ্বারা, বিক্ষেপকে উপাসনার মাধ্যমে এবং আবরণকে জ্ঞান দ্বারা দূর করলে আত্মস্বরূপ সূর্যের মতো প্রকাশ মান হয়। উত্তম সাধনপন্থা হল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ একান্ত মনে ধ্যান করাই বেদশাস্ত্র বিহিত পথ।

প্রশ্ন : শরীরে অহং ভাবনা থাকাকালীন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ধারণা করার চেষ্টায় কি দোষ হবে না, এই ভাবনাটি কি প্রত্যক্ষ শরীরে আরোপ করা হচ্ছে না?

উত্তর : প্রথমে চিদাভাসেই ব্রহ্মভাবনা করতে হবে। (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রকাশিত শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্বকে চিদাভাস বলে)। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই জ্ঞানাগ্নি চিদাভাসরূপী (অন্তঃকরণ) কাষ্ঠকে ভস্ম করে জ্ঞানরূপী অগ্নিসহ নির্বাপিত হবে। তখন একমাত্র অবাঙমানসগোচর নিজ স্বরূপভূত আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।

প্রশ্ন : মৃত্যু কি?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ও নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য যৎসামান্য। নিদ্রার মধ্যে প্রতি প্রাণী ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়। প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে থাকে। যেমন জাগ্রত অবস্থা থেকে স্বপ্নাবস্থায় গেলে সন্ধিক্ষণে মূর্ছা হয়ে থাকে। আবার স্বপ্ন থেকে সুষুপ্তিতে গেলেও মূর্ছা হয়ে থাকে। সেই রকম জীবন শেষে মৃত্যু ও তারপরে পুনর্জন্ম হবার সন্ধিক্ষণে মূর্ছা হয়। এই মূর্ছাই হল মৃত্যু। এই মূর্ছা পুণ্য ও পাপানুসারে অল্প ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে মূর্ছা ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুটি হয় দীর্ঘস্থায়ী। এই মাত্র প্রভেদ। মৃত্যু মূর্ছাটি একটা বড় রকম পরিবর্তনের জন্য হয়। এজন্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই মৃত্যুরূপী মূর্ছা থেকে জাগার পর 'সূক্ষ্ম শরীর' নিজের ভাবনা অনুযায়ী নতুন শরীর গ্রহণ করে। কিম্বা পাপ পুণ্য ভোগ করার জন্য বিভিন্ন লোকে গমন করে। স্থূল শরীর সূক্ষ্ম দেহে পরিবর্তিত হয়ে নিজ নিজ কর্মসংস্কার হেতু ভোগ করার জন্য পুনরায় নতুন শরীর গ্রহণ করে।

আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব পর্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের মৃত্যু হয় না। কেবল মাত্র জরাজীর্ণ স্থূল শরীরের পতন হয় এবং সূক্ষ্ম কারণ শরীর নতুন শরীর গ্রহণ করে।

গীতায় এইজন্য বলা হয়েছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।। (গী. ২।২২)

অর্থাৎ মানুষেরা যেমন জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, সেই রকম আত্মাও জীর্ণ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নবদেহ ধারণ করে। এইজন্য মৃত্যু একটি সহজ সরল স্বাভাবিক পরিবর্তন মাত্র।

প্রশ্ন : তা হলে পাপপুণ্য কে ভোগ করে?

উত্তর : সপ্তদশ তত্বের গঠিত সূক্ষ্ম শরীর লোকপরলোক গমনাগমন এবং পাপপুণ্য ভোগ করে থাকে। স্থূল শরীর জড় মাত্র। সে কোনোরূপ পাপপুণ্য করে না এবং সেজন্য সে ভোগও করে না।

ভক্তপ্রবর রাধারমণ লালজী তাঁর 'বেদান্ত বোধ : নাঙ্গা বাবার উপদেশাবলী' বইতে লিখেছেন—আমরা একবার পুরীধামস্থ গির্ণারী পাহাড়ে বসিয়া তাহার মনোমুগ্ধকর পরম রমণীয় সৌন্দর্য দেখিতেছি। দক্ষিণে তরঙ্গমালা সমন্বিত বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পুরীর শ্রীমন্দির, উত্তরে শাখা যমুনা নদী এবং পশ্চিমে উচ্চাবচ তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপর নয়নাভিরাম সুন্দর হরিৎ বৃক্ষশ্রেণী মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল। শ্রীশ্রী বাবাও বসিয়া আছেন যেন সাক্ষাৎ শিব। আমি বলিলাম, 'এইতো আমাদের প্রেয় ও শ্রেয়। আপনার শ্রীচরণের নিকট নির্ভয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছি। প্রকৃতি নির্জন আশ্রমটির মনোহারিত্ব বৃদ্ধির জন্য নানা রূপ ধরিয়া স্থানটিকে সাজাইয়াছেন। কে না চাহিবে যে, এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সে অমর হইয়া থাকে ও সর্বদা আপনার শ্রীচরণ সেবার সৌভাগ্য পায়?

উত্তরে বাবা বলিলেন, যিনি সৃষ্টির প্রকৃত তত্ব ও রহস্য জানিয়াছেন, একমাত্র আত্মানুভবী সেই মহাপুরুষই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাইয়া থাকে ও সে আনন্দ পাইবার তিনি অধিকারী। তোমরা অভিনয় দেখিয়া থাক। জানিও—অভিনয় ও অভিনেতা দুইই মিথ্যা। অভিনেতা জানেন যে তিনি হরিশচন্দ্র নন; কিন্তু অভিনেতা নিজে এবং দর্শকরূপে তোমরা, যখন করুণ দৃশ্য আসে করুণার এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্য আসিলে ভয়ে অভিভূত হইয়া থাক। কাহারো মনে থাকে না যে ইহা অভিনয় মাত্র। এই জগতেও তাহারাই সুখী হইতে পারে, যাহারা সমস্ত জগৎকে মায়ার অভিনয় এবং নিজেকে অভিনয়দ্রষ্টা বলিয়া মানে। যেমন আমি আমার কৈলাসে বসিয়া আছি। পাশে আমার অক্ষয় বট। নীচে সংসারী মানুষেরা যখন নিজের বাঁধা মোট লইয়া অতিকষ্টে হাঁটিতে থাকে, তখন দেখিয়া হাসি এইজন্য যে, ইহারা মোট নিজেই বাঁধিয়া তাহা বহিতে গিয়া কেমন কাতর হইতেছে। এইজন্য সংসারী লোকের কোথাও সুখশান্তি পাওয়া কঠিন, কারণ তাহারা উহা চায় না।

নাঙ্গা বাবা বেদান্তের চরম সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গীতা উপনিষদ ইত্যাদি শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করতেন না। বেদান্ত মার্গে বহু মহাপুরুষ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথের পথিক হয়েছেন। কাকেও কম মনে করা চলে না। বশিষ্ঠদেব, ব্যাসদেব, ভগবান রাম এবং ভগবান কৃষ্ণের নাম প্রবৃত্তিমার্গের আদর্শ পথিক রূপে পাওয়া যায়। অন্যদিকে সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, বামদেব, শুকদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি অবধূত মহাপুরুষগণ নিবৃত্তিমার্গে চিরস্মরণীয় স্থান গ্রহণ করে আছেন। যোগবাশিষ্ঠে বহু রাক্ষস মহানপুরুষের নামও বেদান্ত মার্গের পথিকরূপে নেওয়া হয়েছে। কোনো মহাপুরুষের জীবন যতই মহৎ হোক না কেন, তা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করা, কি তাঁর নির্দেশ মতো চলা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকেই জীবনের যে কোনো দিকে অপূর্ণতা অনুভব করিবেন। নিজ আবশ্যক মতো বেদান্তের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জটিলতা দূর

করতে পারবেন। বেদান্ত একদিকে যেমন সর্বধর্মের সমর্থক, অন্যদিকে তেমনি নিজের পথ জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তিরূপে ভিন্ন করে বেছে নিয়েছেন।

বাবা কাহারো সঙ্গে আপোস করে মধ্যবর্তী নীতি গ্রহণের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বেদান্ত প্রত্যেক ধর্ম ও তার দাবীকেও সমর্থন করে, এটাই বেদান্তের বিশেষত্ব। এমনকি বর্তমান যুগের বস্তুবাদ ভৌতিকবাদের সঙ্গে পার্থক্য থাকা সত্বেও কোনোরূপ বাদবিবাদকে আবশ্যক বলে মনে করে না। এই জন্য এই ধর্ম সর্বসময়ে সর্বকালে সকলের জন্য সমানরূপে প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেকেরই তা জানা দরকার। ভারতীয় সমাজে নির্ভুল নীতি কার্যকারী করলেই প্রকৃত মঙ্গল এবং সেইজন্য বেদান্ত স্বাধ্যায় ও অনুধাবনই যে জগৎকে স্থায়ী সুখ-শান্তি প্রদান করবে, তাতে তিলমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। বেদান্ত সংসারত্যাগীদের অপেক্ষা কর্মযোগীদের জন্যই অধিক প্রয়োজনীয়, তাতেও সন্দেহ নেই।

বেদান্ত লোককে নিষ্কর্মা ও আলস্যপরায়ন করে ফেলবে, এই অপবাদের একমাত্র উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রবৃত্তিমার্গে তাঁর মতো অন্য একজন মহাপুরুষ জগতের ইতিহাসে পাওয়া কঠিন। বাবা প্রায়ই ধর্মপিপাসুদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আগে তুমি বল যে তুমি শরীরাদি জড় পদার্থ না চেতন? যদি জড় না হও, তাহলে তুমি শরীরাদি জড়পদার্থ নও, তুমি চৈতন্য। অতএব কি কি জড় পদার্থ এবং আমি কেনই বা চৈতন্য তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

বাবা বলেন, সমস্তই চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত। তোমার ধারণা যেন স্বপ্নশরীর তোমার দেহটি, কিন্তু তা ঠিক নয়। স্বপ্নশরীর এবং স্বপ্ন একই বস্তু। জেগে উঠলে দুইয়েরই বিনাশ হয়। স্বপ্ন অবস্থায় সাক্ষী চৈতন্য থাকে। তা না হলে স্বপ্নের অনুভূতি বা স্মৃতি জাগ্রত অবস্থায় আসতে পারত না। স্বপ্ন ও স্বপ্নশরীর দু'টি প্রকৃতপক্ষে কোনো পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট নয়। জাগলে একথা তোমরা সকলেই জানতে পারো। স্বপ্ন জগৎ এবং তোমরা যাকে স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করো সেই তোমাদের শরীর, দুই একই বস্তু। এ মিথ্যা, কারণ এদের বিনাশ আছে। স্বপ্নশরীর স্বপ্নদ্রষ্টা নয়, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য আত্মা।

সাক্ষী চৈতন্য আত্মা সেইরূপে জাগ্রত জগতের এবং এই জগতস্থ স্থুলশরীরেরও নির্মাতা এবং তাদের সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা। স্বপ্ন ও জাগ্রত দুই জগৎ এবং দুই শরীর একই বস্তু। কিঞ্চিৎমাত্র যা প্রভেদ। তা হল এই যে স্বপ্ন প্রাতিভাসিক এবং ক্ষণস্থায়ী। জাগ্রত ব্যবহারিক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। দুই একই বস্তু এবং মিথ্যা। স্বপ্নদ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য যেন নিজ তেজবলেই ওই কাল্পনিক সৃষ্টিটি রচনা করেন। (এই জন্য স্বপ্ন-আত্মাকে তৈজস-আত্মা বলা হয়) এবং তার অভিনয়টি দেখে থাকেন। সেইরূপে জাগ্রত জগৎ সৃষ্টি করে তাতে একটা মিথ্যা স্থূলরূপ মিথ্যা অভিমান দিয়ে স্থাপিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি দ্রষ্টারূপে পৃথক থেকে সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রতের অভিনয়টি দেখে থাকেন।

নাঙ্গা বাবার উপদেশের সারমর্ম হল এই রকম :

প্রাণীমাত্রেই সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে থাকে। জগতের বিনাশশীল অস্থায়ী পদার্থ কখনো স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সর্ব দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলা হয়। মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য বস্তুর দ্বারা হয় না। কর্ম ও সাধনার ফল উত্তম লোকাদি প্রাপ্তি এবং ফলভোগের পর পুনর্জন্মের কারণ।

ব্রহ্মজ্ঞান দু'প্রকার—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এইরূপ জ্ঞানকে পরোক্ষ এবং 'সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম আমি' এরূপ যে জ্ঞান তাকে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়। সদগুরু এবং সৎশাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস করলে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় এবং গুরুমুখে 'তত্বমসি' আদি মহাবাক্য শ্রবণ করে বিশ্বাস করলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দু'প্রকারের—অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট।

দেহের অহং ভাবনাকে বিনাশ করে এবং ব্রহ্ম অহং ভাবনা করে আত্মা এবং ব্রহ্মকে যখন অভিন্ন জ্ঞান করা হয় তখনই দৃষ্ট অপরোক্ষ জ্ঞান পূর্ণ হয়। আত্মা এবং অনাত্মাকে ভিন্ন করে জানাই বিচার। এইরূপ বিচার

কিন্তু ঈশ্বর, বেদ, গুরু, এবং নিজ অন্তঃকরণের কৃপার ওপর নির্ভর করে। এই বিচারের দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিচারের বিষয় হবে (ক) আমি কি? (খ) ব্রহ্ম কি? (গ) প্রপঞ্চ কি? এই তিন বস্তুরই বিচার প্রয়োজন। এই তিন বস্তুর সাধারণ স্বরূপ হবে—আমি এবং ব্রহ্ম 'চৈতন্য'। প্রপঞ্চমাত্রই 'জড়'। যে জ্ঞানস্বরূপ ও প্রপঞ্চাদিকে জানে, কিন্তু মন আদি ইন্দ্রিয় যাকে জানতে পারে না, সে 'চৈতন্য'। যে নিজেকে জানে না সে অপরকে জানে না। এইরূপ যে অজ্ঞান এবং তার কার্যভূত ভৌতিক পদার্থই জড়।

প্রশ্ন : শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের আরোপ কি করে হল?

উত্তর : অনাদি শুদ্ধ ব্রহ্মে কল্পিত অনাদিপ্রকৃতি আছেন। সেই প্রকৃতির ব্রহ্মের সঙ্গে অনাদি কল্পিত সদাত্মা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধও কল্পিত ভেদসহ বাস্তবপক্ষে অভেদ স্বরূপ। এই প্রকৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) মায়া (২) অবিদ্যা (৩) তমঃ প্রধান প্রকৃতি।

প্রশ্ন : (১) আরোপ (২) অনাদি (৩) কল্পিত ইত্যাদির অর্থ কি?

উত্তর : (১) ব্রহ্মরূপ সৎ বস্তুতে অজ্ঞান ও তৎকার্যরূপে অসম্ভব কল্পনাকে আরোপ বা অধ্যারোপ বলা হয়। অধিষ্ঠান থেকে আরোপিত বস্তু কখনো ভিন্ন হয় না।

(২) জীবের অবিদ্যারূপ উপাধিকে অনাদি বলা হয়। উৎপত্তিরহিত বস্তু স্বরূপে অনাদি। অবিদ্যা ও তার কার্য এই সংসার—উভয়েই অনাদি বলে স্বীকৃত হয়। অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন এই জগৎ অনাদি হলেও প্রাগভাবের ন্যায় বিনাশশীল, নিত্য নয়।

(৩) যা হয়নি, কিন্তু স্বপ্নের মতো ভ্রান্তিবশত প্রতিভাত হয়, তাকে কল্পিত বলে। অর্থাৎ আত্মার জীবভাব এবং জন্ম মরণাদি সংসার কল্পিত।

মায়া অনাদি ব্রহ্মের শক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা কারণরূপা। তন্মধ্যে যা শুদ্ধ সত্বগুণবিশিষ্ট তা মায়া। যা মলিন সত্বগুণবিশিষ্ট, তা অবিদ্যা এবং যা তমগুণে প্রধান তাই তম:প্রধান প্রকৃতি।

অধিষ্ঠান ব্রহ্মে মায়া সংযুক্ত হলে হয় ঈশ্বর। অধিষ্ঠান কূটস্থের অবিদ্যাতে পতিত প্রতিবিম্ব থেকে অল্পজ্ঞ 'জীব'। এই ঈশ্বরও জীব্য ও অনাদি কল্পিত। তন্মধ্যে ঈশ্বরের উপাধি মায়া এবং আপেক্ষিক ব্যাপক। সেই জন্য ঈশ্বর এক এবং ব্যাপক।

জীবনের উপাধি অবিদ্যা নানা এবং পরিচ্ছিন্ন। সেই জন্য জীবও নানা এবং পরিচ্ছিন্ন।

মায়া এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতি দুটিকেই ঈশ্বরের উপাধিরূপে গ্রহণ করতে হবে। মায়া উপাধি গ্রহণে কুম্ভকারের ন্যায় ঈশ্বর জগতের 'নিমিত্ত কারণ' এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতিকে নিয়ে মৃত্তিকার মতো জগতের 'উপাদান কারণ।'

জীব এবং ঈশ্বরের অনাদি কল্পিত ভেদ আছে। সৃষ্টির পূর্বে জীবের উপাধি অবিদ্যা। জীবগণ কর্মসহ মায়াতে লীন হয়ে থাকে। সুষুপ্তিতে অবিদ্যা যেরূপ লীন হয়ে থাকে, একরূপতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেরূপ জীবও কর্মসহ মায়ায় লীন হয়ে একরূপতা প্রাপ্ত হয়। ফলে সৃষ্টির পূর্বে কোনোরূপ, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ থাকে না এবং এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মই থাকেন।

সেই ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তিতে জীবের কর্মফল যখন পরিপক্ক হয় সেই সময় 'আমি এক, বহু হব' এরূপ ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছা হওয়ার জন্য ব্রহ্মের উপাধি মায়াতে ক্ষোভ হয়ে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এরা তখন সূক্ষ্ম। তাই তাদের পঞ্চতন্মাত্রা বলা হয়। প্রথমে এই পঞ্চতন্মাত্রা সমষ্টি এবং ব্যষ্টি রূপে সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় তারপর পঞ্চতন্মাত্রায় পঞ্চীকরণ হয়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

সমষ্টি স্থূল এবং কারণ প্রপঞ্চের অভিমানী জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চের অভিমানী 'জীব'। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলে নিত্যমুক্ত। জীব অল্পজ্ঞ বলে বদ্ধ।

এইরূপে শুদ্ধব্রহ্মে প্রপঞ্চের কল্পিত আরোপ হয়েছে। এই আরোপ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, সাক্ষীতে স্বপ্নের ন্যায়, এবং দর্পণে নগরের প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা। এইরূপ আরোপ অজ্ঞানতা বশত হয়ে থাকে। এর নিবৃত্তি

হয় ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা। ব্রহ্মস্বরূপকে যথার্থ জানার নাম জ্ঞান-প্রাপ্তি।

জ্ঞান হলে মায়া এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কার্য সহিত প্রকৃতির এবং প্রকৃতি ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের নিবৃত্তি হয়। জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের ও জীব-ঈশ্বর ভেদের নিবৃত্তি হয়। এই ভাবে বন্ধনের নিবৃত্তি হয়ে মোক্ষলাভ হয়।

প্রশ্ন : শরীর সৃষ্টি কিরূপে হয়?

উত্তর : প্রপঞ্চময় জগৎ সৃষ্টির পর পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূলদেহের সৃষ্টি হয়। পঞ্চতন্মাত্রার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের মূল উপাদানগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে। মূলা অবিদ্যার দ্বারা কারণ শরীরের সৃষ্টি। এইরূপে শরীর তিন প্রকার—কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর।

পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পঁচিশতত্বে স্থূল দেহ গঠিত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, এবং পৃথিবী পাঁচটি পঞ্চমহাভূত। এই পঞ্চমহাভূত নিজ নিজ অংশে অর্ধেক রেখে বাকী অর্ধ অংশকে চারভাগে বিভক্ত করে বাকী চার ভূতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এইভাবে পঁচিশ তত্বের উৎপত্তি হয়। এইরূপ সমিশ্রণকে পঞ্চীকরণ বলা হয়।

এইরূপে এই পঁচিশ তত্বের স্থূল দেহ গঠিত হয়। এরই মৃত্যু হয়। এই পঁচিশ তত্বের স্থূল দেহ, তার ধর্ম জানলে (১) নাম, (২) জাতি, (৩) আশ্রম, (৪) বর্ণ, (৫) সম্বন্ধ, (৬) পরিণাম, (৭) জন্মমরণ ইত্যাদি আমি নই, এরা আমার নয়, আমি এই সকলের সাক্ষী—এইরূপ জ্ঞান জন্মায়।

জন্মের পূর্বে নাম ছিল না। জন্মের পরে নাম কল্পিত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন নাম আছে। এই নাম আমি নই, তা স্থূলদেহে কল্পিত। সেইরূপ জাতিও স্থূলদেহে কল্পিত। আশ্রমও স্থূল দেহে আরোপিত। বর্ণও স্থূল শরীরের। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, গুরু-শিষ্য ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থূল দেহেরই মিথ্যা সম্বন্ধ, বিচার দ্বারা এদের পাওয়া যায় না। সবসময়েই দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা ভিন্ন হয়ে থাকে। আমি দ্রষ্টাবৎ এদের দ্রষ্টা। আর এরা ঘন্টাবৎ দৃশ্য। পরিণাম ও মৃত্যু স্থূল দেহের। আমি আত্মা যার জন্ম মৃত্যু হয় না। আত্মার জন্ম ও মরণ নেই। এই আত্মা জায়তে (জন্ম), অস্তি (প্রকটতা), বর্ধতে (বুদ্ধি), বিপরিণমতে (বিপরিণাম), অপক্ষীয়তে (অপক্ষয়), নশ্যতি (মরণ)—এই ছয়প্রকার বিকার রহিত।

প্রশ্ন : সূক্ষ্ম দেহ কি?

উত্তর : অপঞ্চীভূত পঞ্চমহাভূতে সপ্তদশ তত্বের সূক্ষ্ম শরীর। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ, এক মন, এক বুদ্ধি—এই সতের তত্বের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি হয়।

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ এবং গুহ্য এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ। সঙ্কল্প বিকল্পরূপ বৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। এই সপ্তদশ তত্বের সূক্ষ্ম শরীর। এর বিনাশ নেই।

যাকে আমি জানি বা অনুভব করি সেই বস্তু আমি হতে পারে না। আমি স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম দেহকে জানি। তারা যে উপাদানে সৃষ্ট তাও জানি। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সহ অন্তঃকরণের চারটি ইন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার) এরা কাজ করলে তাকে জানি এবং না করলে তার অভাবকেও জানি। কাজেই তা আমি হতে পারে না। বাকী রইল কারণ শরীর। কারণ শরীরই স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহের কারণ। এইজন্য একে কারণ শরীর বলা হয়। তা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট। যে অবস্থায় জাগ্রতও থাকে না, স্বপ্নেরও অভাব হয় সেই গাঢ় নিদ্রার অনুভূতিকে সুষুপ্তির অবস্থা বলে। এই সুষুপ্তির শরীরই কারণ শরীর। আমরা চিন্তা করে না দেখলেও এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঘটে থাকে। জাগ্রত থাকলে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হয় না। স্বপ্ন হলে জাগ্রত ও সুষুপ্তি থাকে না। সুষুপ্তি হলে জাগ্রত ও স্বপ্নের একান্ত অভাব হয়। সুষুপ্তির পর জেগে উঠে বলি—আমি খুব আনন্দে ঘুমাচ্ছিলাম। আর কিছুই জানি না। জানি না বলতে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা বোঝায়।

আমি জানি কিংবা জানি না, এগুলি হল অন্তঃকরণের বৃত্তি। অন্তঃকরণ হল মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার। সেই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং তার বিষয়ের সহিত তাকে আমি জানি এবং আমি তার জ্ঞাতা, ঘন্টাদ্রষ্টাবৎ তার দ্রষ্টা। তার থেকে ভিন্ন। এইরূপে কারণ দেহের আমি দ্রষ্টা।

কোশ অর্থে আবরণ। যেমন তরোয়ালের কোশ। পঞ্চকোশ দ্বারা আবৃত হয়ে আত্মা প্রকাশ পায় না। আত্মার ওপরের আবরণ সরাতে পারলে আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশ পান।

কোশ হল—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়ে প্রাণই প্রাণময় কোশরূপে পরিণত হয়। প্রাণময় কোশ অপঞ্চীকৃত বায়ুর বিকার বলে তা আত্মা হতে পারে না।

পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনকে একত্রে মনোময় কোশ বলা হয়। 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি বাসনার কারণ হল মন। মনই সংসার বন্ধনের হেতু অবিদ্যা। মনের নাশ হলে সংসার বন্ধন দূর হয়। মনের প্রকাশে সংসার প্রকাশিত হয়। আর সংকল্প ত্যাগ হলে মনের নাশ হয়। মনোময় কোশ আত্মা নয়।

বুদ্ধি যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত, অহংকারাদি বৃত্তি এবং 'আমি কর্তা' এই অনুভবের সঙ্গে বর্তমান থাকে—তাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। বিজ্ঞানময় কোশই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। এই কোশ শুদ্ধ আত্মার এক উপাধি। কিন্তু বিজ্ঞানময় কোশ আত্মা নয়।

কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে প্রকাশপ্রাপ্ত, প্রিয়-মোদ-প্রমোদরূপে পরিণত, স্থিরীকৃত, এবং অন্তর্মুখ তমোবৃত্তি আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়ে আনন্দময় কোশে পরিণত হয়। দেহধারী ব্যক্তি আনন্দময় কোশে সুখানুভব করে। সুষুপ্তি কালে আনন্দময় কোশের বিশেষ প্রকাশ হয়। তমোগুণরূপ উপাধিযুক্ত বলে, প্রকৃতির পরিণাম বলে, অন্নময়াদি বিকার সমূহের মধ্যে বর্তমান বলে, এই আনন্দময় কোশও পরমাত্মা হতে পারে না।

বিবেকবিচার দ্বারা পঞ্চকোশের কোনটিই আত্মা নয়, এই প্রকার দৃঢ় ধারণা জন্মায়। তখন শুদ্ধ, সদানন্দময় আত্মা সাক্ষী স্বরূপে অন্তরে প্রকাশিত হন। আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি এই বিচার যথাযথ ভাবে করতে পারলে আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা কর্তব্য।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সপ্তদশ তত্বের উৎপত্তি এইভাবে হয়েছে।

পঞ্চভূত	জ্ঞানেন্দ্রিয় (সত্ত্বগুণজ)	কার্য	কর্মেন্দ্রিয়	কার্য
আকাশ	শোত্র	(শব্দ) শ্রবণ	বাক্	বাক্য বলা
বায়ু	ত্বক	স্পর্শ	পাণি	কার্যকরা
অগ্নি	চক্ষু	(রূপ) দর্শন	পাদ	গমনাগমন
জল	জিহ্বা	(রস) গ্রহণ	উপস্থ	মূত্রত্যাগ
পৃথিবী	ঘ্রাণ	(গন্ধ) গ্রহণ	গুহ্য	মলত্যাগ

সপ্তদশ তত্বের সূক্ষ্ম শরীরকে জানার ফলে, এই সপ্তদশ তত্ব আমি নই এবং এরা আমার নয়; এরা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের, ঘটদ্রষ্টাবৎ আমি এদের দ্রষ্টামাত্র—এই জ্ঞানলাভ হয়। যে যাকে জানে সে তার থেকে আলাদা হবে, এটাই নিয়ম। যেমন মন ভালো নেই বললে মন যে আলাদা বস্তু, তা বুঝতে পারা যায়। মন আমার থেকে আলাদা, আমি এর দ্রষ্টা।

একদিন সকালে শাস্ত্রপাঠ শেষ হয়েছে। একজন বিদেশী ভক্ত বাবাকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, বাবা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন। আমার প্রশ্ন হল, একজন মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে না। সে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতি অনুসরণ করে না। কখনো মন্দিরে বা গীর্জায় যায় না। আর কখনো কোনো ধর্মের উপদেশাবলীও শ্রবণ করে না। কিন্তু সে সব সময় সকলের মঙ্গল চিন্তা করে এবং সারা জীবন ধরে অন্যের ভালো করার চেষ্টা করে চলেছে। বাবা দয়া করে বলুন তো এই ব্যক্তিটি জীবনের শেষে মুক্তিলাভ করবে কি না?

শুনে বাবা একমিনিট কাল চোখ বন্ধ করে মৌন থাকলেন। সকলে বাবার উত্তরের আশায় নীরবে অপেক্ষা করছেন। বাবা চোখ খুলে বললেন, হ্যাঁ, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এই রকম কথা বলা আছে। বাবার উত্তর শুনে বিদেশী ভক্তটি আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন। কৃতজ্ঞতার স্বরে বললেন, বাবা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট।

এক প্রশ্নের উত্তরে নাঙ্গা বাবা বলেন, সাধনার পথে অনেক সময় দৈবের ব্যাঘাত আসে। তাকে বলে সুরবিঘ্ন। কোনো কোনো দেবতা মানুষের মুক্তিলাভের সাধনাকে পছন্দ করেন না। তাঁরা মানুষদের মনে করেন তাঁদের সেবক। মানুষেরা যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, উৎসর্গ দেয় তাতে তাঁদের লোভ থাকে। যখন তাঁরা দেখেন সেই মানুষ সাধনার মাধ্যমে মুক্তিলাভ করতে যাচ্ছে অর্থাৎ সেবক উচ্চতর লোকে চলে যাচ্ছে, তখন তাঁরা নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। সেই বাধাগুলি দুর্ভাগ্যের আকারে নেমে আসে। তাতে অনেক সময় স্ত্রীপরিবারের ওপরও আপদবিপদ এসে পড়ে। আর্থিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে ঘটে যায় নানা বিপর্যয়। এই বাধা-বিঘ্ন সত্বেও যে মানুষ সাধন পথে এগিয়ে চলে, তার ওপর দেবতাগণ প্রসন্ন হন এবং তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

এক বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বুদ্ধের অবতারত্ব নিয়ে আলোচনা চলছিল। একজন প্রশ্ন করলেন, বাবা বুদ্ধদেব তো একজন অবতার ছিলেন। তাঁর বোধিলাভের কথা শুনে মনে হয় তিনি পরাজ্ঞান অবশ্যই লাভ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি কি বলেন?

একটু চুপ করে থেকে নাঙ্গা বাবা বললেন, দেখ তোমরা কিন্তু অবতারকে বড় সহজলভ্য আর সস্তা করে ফেলছ। অবতার এলে যুগ পরিবর্তন হয়। যেমন, হয়েছে রাম আর কৃষ্ণের কালে। আজকাল তো প্রতি মহল্লায় অবতারের আবির্ভাব। আরে আসল হিসাবে তুমিই তো এক অবতার। এই বিশ্বে যত জীব আছে প্রত্যেকেই ব্রহ্মের অবতার।

দিগম্বর বাবার মতে আত্মজ্ঞান সাধনার দুটি অঙ্গ—(১) অন্তরঙ্গ সাধন ও (২) বহিরঙ্গ সাধন। ব্রহ্মবিদ গুরুর আশ্রয় নিয়ে ত্যাগ তিতিক্ষা বৈরাগ্য অবলম্বন করে শ্রুতিবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই অন্তরঙ্গ সাধন বলে। অন্তরঙ্গ সাধনের পরম্পরা হল :

ক। বিবেক—আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি, এই বিচার যথাযথ ভাবে করতে পারলে আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারের ক্ষমতাই বিবেক।

বিবেক চূড়ামণিতে বলা হয়েছে—

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্ বিবেকেনৈব সিদ্ধ্যতি।

ততোবিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ।। বি.চূ. (১০৩)

খ। বিচার দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ পৃথকরূপে জানার পর সংশয় রহিত জ্ঞান থেকে সম্যগবিবেক মায়া থেকে উৎপন্ন মোহ বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। মায়াবন্ধন নষ্ট হয়ে গেলে তার আর জন্ম হয় না।

ঘ। বৈরাগ্য—নিজের দেহ থেকে ব্রহ্মার দেহ পর্যন্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তু সমূহের দোষ দর্শন ও শ্রবণের ফলে মনে যে সকল বিষয়ত্যাগের যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সেই ইচ্ছাকে বৈরাগ্য বলে। যে সাধকের বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা পূর্ণমাত্রায় থাকে, সেই সাধকের শমাদি সাধনা সার্থক হয়। তীব্র বৈরাগ্যবান সাধকের সমাধি লাভ হয়। সমাহিত ব্যক্তিরই কেবল সংশয়রহিত তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তত্বজ্ঞ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত হন এবং নিত্য সুখ

লাভ করেন। সুতরাং বৈরাগ্য অবলম্বনেই প্রকৃত সুখ। সংযত ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য অপেক্ষা সুখদায়ক দ্বিতীয় কোনো বস্তু নেই। এরপর ষটসম্পত্তি, যথা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। বিবেক চূড়ামণিতে আরোও বলা আছে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দোষ দর্শন দ্বারা বিষয়সমূহে বৈরাগ্য আসার ফলে মনের নিজের লক্ষ্য ব্রহ্মে যে স্থিতি তাকে শম বলে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে ভোগবিষয় সকল থেকে সরিয়ে নিয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের নিজের স্থানে নিশ্চলভাবে রেখে দেওয়াকে দম বলে। দমের সাধনে শম সাধিত হয়। চিত্তবৃত্তি সমূহের বাহ্য বিষয়াকারে পরিণত না হওয়ার অবস্থাকে বলে উপরতি।

ইন্দ্রিয় সংযমের সাধন নির্জনবাস। চিত্তসংযমের সাধন দম। শমের দ্বারা অহং বাসনার লয় হয়। বাসনার লয় হলে সাধকের সর্বদা অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের রসানুভূতি হয়ে থাকে। তাই সাধকের চিত্তনিরোধের জন্য যত্নশীল হওয়া উচিৎ। আত্মানন্দে মগ্ন থাকার জন্য পরমশান্তিলাভ উপরতির ফল।

যে কোনো প্রকার দুঃখ উপস্থিত হোক না কেন, তার জন্য মনে কোনো চিন্তা ভাবনা না করে, দুঃখের কথা কাউকে না বলে, দুঃখ দূর করার কোনো চেষ্টা না করে সহ্য করার ক্ষমতাকে তিতিক্ষা বলে।

গুরুর উপদেশ এবং বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষা যথার্থ সত্য বলে দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তরে গ্রহণ করাকে জ্ঞানীগণ শ্রদ্ধা বলে থাকেন। এই শ্রদ্ধার সহায়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তু পলভ্যতে।। (বিবেক চূড়া.২৫)

সর্বদা সর্বপ্রকার বুদ্ধিকে শুদ্ধব্রহ্মে লগ্ন করে রাখাকে বলে সমাধান। কৌতূহলবশতঃ বেদান্ত তত্বের আলোচনার ফলে মনে যে তৃপ্তিলাভ হয়, তাকে সমাধান বলা যায় না।

সাধন চতুষ্টয়ের অন্যতম হল মুমুক্ষুত্ব।

আত্মস্বরূপের উপলব্ধি সহায়ে অবিদ্যা হতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম অহংকার থেকে আরম্ভ করে স্থূলদেহ পর্যন্ত সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা মুমুক্ষুতা নামে অভিহিত হয়।

'তত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ সাধন—

তত্বমসি এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বম্'—এই দুই পদের লক্ষীভূত এবং শোধিত ব্রহ্মের ও জীবের সম্পূর্ণ একত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। সেই ঐক্য জীব ও ব্রহ্মের লক্ষিত অর্থেরই বর্ণনা। বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট দুই বস্তুর ঐক্য কিন্তু আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হয়নি। জোনাকি ও সূর্যের ঐক্য যেমন আক্ষরিক অর্থে সম্ভব নয়, তেমনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ঐক্য আক্ষরিক অর্থে সম্ভব নয়। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উভয়ের চৈতন্য স্বরূপতায়—এইভাবে বুঝতে হবে। এই মহাবাকের 'তৎ' ও 'ত্বম্'—ব্রহ্মা ও জীব—এই উভয়ের বিরোধী ধর্মসমূহ ত্যাগ করে এবং মাত্র চৈতন্য অংশকে গ্রহণ করে বিচারশীল ব্যক্তিগণ অদ্বয়বোধ স্বরূপের উপলব্ধি করে থাকেন। এই প্রকারে বেদোক্ত অন্য মহাবাক্যসমূহের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও অভেদত্ব বর্ণিত হয়। (বিবেকচূড়া পৃ. ১৭৫-১৭৬)

এরপরে সাধন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্।।

(বিবেক চূড়া শ্লো. ৩৬৪)

ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ থেকে শ্রুতবাক্যের মনে মনে বিচার শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনন অপেক্ষা ধ্যান লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ। আর অন্তঃকরণের নির্বিকল্প অবস্থাকে (নির্বিকল্প সমাধিকে) অনন্তগুণ কল্যাণকর বলে মনে করতে হবে।

আত্মজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে আলোচনা কালে একদিন নাঙ্গাবাবা বললেন, আত্মজ্ঞানের উদয় হলে আর শরীর থাকে না। ওমনি একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, বাবা তবে আপনি এই দেহে বিদ্যমান রয়েছেন যে? আপনার দেহপাত হয়নি কেন?

নাঙ্গা বাবার চোখেমুখে এক দিব্য প্রশান্তির ভাব। তিনি শান্ত গভীর স্বরে বললেন, তুমি বালক এর রহস্য বুঝতে পারবে না। তবে জেনে রাখ, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন, তার ফলেই পূর্ণ আত্মজ্ঞানী মহাসাধককে তাঁর দেহটি বাঁচিয়ে রাখতে হয়। দেহ দিয়ে ঈশ্বরের অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। এক সাধকের দেহ থেকে আত্মজ্ঞানের দীপশিখা অন্য সাধকের দেহে সঞ্চালিত হয়। সাধনা ও সিদ্ধির পরম্পরা এইভাবেই সুরক্ষিত হয়ে থাকে।

বরিশাল জেলার এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন মাধব পাল। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত দূরবস্থায় পড়েছেন। গির্ণারীবন্তে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে এক ভক্তের সঙ্গে তাঁর চেনাজানা ছিল। তিনি মাধব পালকে নাঙ্গা বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবা সাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে একটা কাহিনী বর্ণনা করলেন।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও নারায়ণ আলাপ করছিলেন। লক্ষ্মী বললেন, প্রভু আপনি এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু লোকে আমাকেই চায় আপনাকে নয়।

পরে লক্ষ্মী ও নারায়ণ ছদ্মবেশে মর্ত্যলোকে এলেন। এক ধনী শেঠের বাড়ীতে উঠলেন। লক্ষ্মী অন্দর মহলে আশ্রয় নিলেন। আর নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শেঠের বাগানের এক কোণে রইলেন। এদিকে লক্ষ্মী যা স্পর্শ করছেন তা সবই সোনা হয়ে যাচ্ছে। শেঠের বাড়ীর সব জিনিস সোনায় পরিণত হল। এত সোনা রাখার আর জায়গা হচ্ছে না। ঠিক হল বাগানে একটা ঘর তৈরি করে সেখানে কিছু সোনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বাগানে ঘর তৈরী করতে গিয়ে শেঠের লোকেরা ব্রাহ্মণ বেশী নারায়ণকে উৎখাত করল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। ফলে লক্ষ্মীর কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। লোকে সোনা-দানা-বিত্ত-সম্পদ চায়, আত্মার মুক্তি চায় না।

এবার নাঙ্গা বাবা মাধব পালকে বললেন, দেখ জীবন হচ্ছে শ্বাস। বহু শ্বাস বাজে কাজে নষ্ট করে ফেলেছ। অনেক কাল অতিবাহিত হয়েছে। এবার বাকী শ্বাসগুলো ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও। তাতেই প্রকৃত মঙ্গল হবে, প্রকৃত শান্তি পাবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে নাঙ্গাবাবা বলেন, মানুষের নিজের মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারাই তার চরিত্র গঠিত হয়। আমাদের প্রতি কর্ম ও ভাবনা আমাদের মনের গভীরে একটা ছাপ ফেলে যায়। তাকে বলে সংস্কার যা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এবং মনে বাসনারূপে ফুটে ওঠে। এই বাসনা আমাদের মনে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এটা কিছুতেই নষ্ট হয় না। এই সঞ্চিত সংস্কার অতীব শক্তিশালী। মৃত্যুর পর এই সংস্কারই পরবর্তী জন্মের প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে থাকে।

বেদান্ত দর্শন বলেন, মানুষের বর্তমান জন্ম প্রারব্ধ অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী হয়। অনুরূপভাবে এই জন্মের কর্মধারাই ভবিষ্যৎ জন্মের গতিপ্রকৃতিকে নির্ধারণ করে। মানুষ যে সকল কর্ম করে তার প্রতিটির কর্মফল সে ভোগ করে। কর্মফল ভোগ না করা পর্যন্ত প্রারব্ধ শেষ হয় না।

গীতায় বলা হয়েছে—অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্মং শুভাশুভম।

তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে দিগম্বর বাবা বলেন, তোমরা যারা তীর্থভ্রমণ ভালোবাস, তারা মনে করো যেন ভগবান শুধু তীর্থক্ষেত্রেই অবস্থান করেন, অন্য কোথাও থাকেন না। বস্তুত তা নয়, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যদি মনে ভাবো ভগবান কয়েকটি পুণ্যক্ষেত্রেই শুধু অবস্থান করেন, তবে তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়।

এক ধনী ভক্ত বাবাকে বলেন, বাবা আপনার আশীর্বাদ যেন তীর্থযাত্রার পথে সতত আমার ওপর থাকে।

বাবা বলে উঠলেন, বেশ যাও। ভালো ভালো তীর্থস্থানে যাত্রা করো। খুব ঘুরে বেড়াও। কিন্তু এখানে যেমন ইট পাথর, ওখানেও তাই। হাতে অনেক টাকা আছে, তাই ঘুরতে পারো। আর তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সকলের কাছে গল্প করো, এটা দেখেছি, ওটা করেছি। এসব অহংবোধ ছেড়ে দিয়ে এবার কোথাও বসে পড়। আত্মজ্ঞান সাধনের চেষ্টা করো।

নাঙ্গা বাবা বলেন, যদি চিত্ত নির্মল হয়, তবে সদগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শ্রবণের মাধ্যমেই জ্ঞানলাভ হতে পারে। জ্ঞানের প্রকাশ হলে মায়া ও অবিদ্যা দূর হয়ে যায়। তখন আত্মজ্ঞানের

প্রকাশ হয়ে থাকে।

একজন স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই নাঙ্গা বাবার আশ্রমে আসতেন। তিনি বললেন, বাবা, দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছি। সাধনার পথে তেমন আর এগুতে পাচ্ছি না।

বাবা তিরস্কারের স্বরে বললেন, আগে একটা একটা করে বন্ধন কাটো। তবে তো সাধনের কথা উঠবে। তা ছাড়া এগুলো হবেই বা না কেন? তোমার তো ব্রাহ্মণ শরীর। ভাগ্যক্রমে এমন দেহ পেয়েছ। প্রাণপণে চেষ্টা করো। এবার এ দেহেই যেন আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

এরপর সকলের উদ্দেশে বললেন, শুধু ধ্যান ভজনে কাজ হয় না। এই সঙ্গে চাই কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য। আহারে বিহারে সংযম নেই। জ্ঞানের উদয় তার জীবনে কি করে হবে? পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলে কেউ কখনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

নাঙ্গাবাবা বলেন, মানুষের সত্যিকারের স্বভাব হল—আত্মাকে জানা। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। আত্মা সর্বব্যাপী নিত্য সনাতন। সৎ, চিৎ ও আনন্দই আত্মার বৈশিষ্ট্য। সর্বকালে যিনি বর্তমান তিনি সৎ, সর্বকালে যিনি সবকিছু জানেন তিনি চিৎ, আর সর্বকালে যিনি প্রিয় বস্তু ও শান্তিপ্রদ তিনি আনন্দ।

বাবা বলেন, মনের প্রকৃতি হল চিন্তা করা। মন সর্বদা চঞ্চল ও শক্তিশালী। মন পারে না এমন কোনো কাজ নেই। মনকে দিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ করানো যায়। বাসনা কামনা হল মনের শত্রু। রিপুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ক্রোধ। মন যদি ক্রোধ রিপুর বশবর্তী হয় তবে শান্তি দূরপরাহত। বাক সংযম অত্যন্ত জরুরী। সবসময় কম কথা বলা উচিৎ। ভেবে চিন্তে কথা বলা কর্তব্য।

তিনি বলেন, একজন সৎ আদর্শবাদী গৃহী একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয়। যে আদর্শ গৃহস্থ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে, সৎসঙ্গ করে, ব্রহ্মবিদ গুরুর উপদেশ মেনে চলে সে-ই মোক্ষলাভ করে। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেও সৎসঙ্গ করা হয়।

বাবার কথায় আত্মজ্ঞান সম্পন্ন যোগীগণ অসাধারণ যোগবলের অধিকারী। তারা ইচ্ছে করলে যা ইচ্ছা দিব্য বিভূতি প্রকাশ করতে পারেন। আত্মজ্ঞানীর শক্তিবলে সৃষ্টি উল্টে যেতে পারে, লয় প্রলয় হয়ে যেতে পারে।

নাঙ্গাবাবার উপদেশ হোল :

অহংকার ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভে যত্নবান হও।

নিজ সত্তার অনন্ত অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। সত্যোপলব্ধি ভিন্ন কোন স্থায়ী শান্তিলাভ হয় না।

প্রথমে অনন্ত সত্যকে জানতে হবে। পার্থিব বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। নিজের আত্মার মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অহংকার দূর হয়।

স্থূল শরীর জড়। সূক্ষ্ম শরীর ভালো ও মন্দ কর্ম করতে পারে। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর কর্মফল ভোগ করে।

ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য ধ্যান ও প্রার্থনার প্রয়োজন। কিন্তু আসক্তি ত্যাগ, আহারে ও বিহারে সংযম অতি আবশ্যক।

যারা ধর্ম ও ভগবান নিয়ে ব্যবসা করে তাদের পক্ষে মুক্তিলাভ করা অত্যন্ত কঠিন। যাদের মন নিম্নমুখী তাদের হাতে কোনো খাবার খেতে নেই। তা হলে সাধকের মনও নিম্নমুখী হয়ে পড়ে।

আমাকে সর্বদা স্মরণ কর, আর সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বাবার খেদোক্তি :

বর্তমান কালে মানুষের পক্ষে বেদান্ত সাধনাই উপযুক্ত। আমার কাছে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে লোকেরা আসে। আর তারা কেবল পার্থিব বস্তুই প্রার্থনা করে। অধ্যাত্ম জগতের বিষয় কেউ জানতে চায় না।

চোদ্দ

আচর্য শঙ্কর প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী হলেও শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী মহারাজ কোনো সাম্প্রদায়িক গুরু ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে দিগম্বর তোতাপুরী ছিলেন যুগাচার্য পরমহংস। যুগ

প্রয়োজনে ঐতিহাসিক কারণে জগতে তাঁর পুণ্য আবির্ভাব। জাতীয় জীবনে এক সংকটময় কালে যখন মোহভ্রান্তি জাল বিস্তার করছে, নাস্তিকতাবাদ প্রবল হচ্ছে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ছে সেই সময় জাতির অধ্যাত্ম চেতনাকে উদ্বোধিত করার জন্য বৈদিক সনাতন ধর্মের জ্ঞানের প্রদীপ হাতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় তিন শতাব্দী কাল তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যাপূত জীবন মানবকল্যাণে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে বটবৃক্ষমূলে শান্ত সমাহিত দিগম্বর বাবার শ্রীমূর্তিখানি একবার মানসনেত্রে দর্শন করা যাক। ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট আজানুলম্বিত বাহু, দিব্য কান্তিমান, তেজস্বী, সুঠাম সর্বাঙ্গ সুন্দর দিগম্বর বাবার শিবকল্প তনু। একবার তাঁকে দর্শন করলে আর চোখ ফেরানো যায় না। কী অপূর্ব অনাবিল নির্বিকল্প ভাব! সুখাসনে উপবিষ্ট দুই জানুর ওপর স্থাপিত দুই বাহু, ব্রহ্ম সমাধি মগ্ন জীবন্মুক্ত পুরুষ। ভূমানন্দে অবগাহন রত। আর্যঋষির মতো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান। স্থূলে ভৌমপ্রপঞ্চে অবস্থান করলেও যেন কোনো অতিন্দ্রিয় চিরশান্তিময় জগতে বিরাজমান। সেই পবিত্র আত্মার কাছে পার্থিব জগতের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ সকলই নিতান্ত তুচ্ছ ও অর্থহীন। এক শুদ্ধসাত্বিক ভাবের আবহ যেন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। স্থানটি অতীব সুন্দর ও মনোরম। সকল অশুভ অমঙ্গল থেকে মুক্ত পবিত্র নিষ্কলুষ। যোগিবরকে বেষ্টন করে আছে দিব্য স্বর্গীয় এক দিকবলয়। পরমশান্তিতে সমাধি মগ্ন হয়ে আছেন তিনি। মুখমণ্ডলে কী অম্লান প্রসন্নতা! ব্রহ্মানন্দে টলমল।

তাঁর শ্রীবিগ্রহ দর্শনই যেন এক পরমপ্রাপ্তি। কী অনুপম সৌম্যকান্তি নয়নাভিরাম! ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং ব্রহ্মই। তিনি যেন সেই শাস্ত্রবাক্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁকে দর্শন করলে ব্রহ্মদর্শন হয়ে যায়। মর্ত্যজীবন ধন্য হয়। স্থানীয় লোকেরা তাই তাঁকে 'সচল ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করেন।

অসাধারণ তাঁর আকর্ষণী শক্তি। সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন। সমগ্র জগৎকে যিনি ব্রহ্মের প্রকাশ বলে মনে করেন তিনি অপূর্ব সমদর্শী হন। জ্ঞানী-অজ্ঞানী, উচ্চ-নীচ, সৎ-অসৎ, শত্রু-মিত্র কেউ তাঁর আপন নয়, কেউ পর নয়। তাই তাঁর আশ্রমে সকলের অবারিত দ্বার। তাঁর কাছে একবার এলে বার বার আসতে ইচ্ছা হয়। পরম শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা আপনি নুয়ে আসে। অগ্নি যেমন মুহূর্তের মধ্যে বিশাল তুলারাশিকে ভস্মীভূত করে ফেলে, তেমনি তার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে পড়লে অতি বড় পাপী-তাপীও শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়।

দিগম্বর বাবা নিজেকে প্রাচীন বটবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একবার এক ভক্ত তাঁর বয়স জানতে চাইলে তিনি বারান্দা থেকে সামনে পুরনো বটবৃক্ষের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, যদি এই বটবৃক্ষকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করো, তবে সে কি বলবে? তারপর সহাস্যে বলেছিলেন, আরে আমার তো জন্মই হয়নি, বয়স হবে কি করে? সত্যই তো ব্রহ্মবিদ চিরকাল ব্রহ্মেলীন থাকেন। জন্ম জরা মৃত্যুর অধীন হতে পারেন না। জীবন্মুক্ত স্বেচ্ছাবিহারী তিনি। যতদিন ইচ্ছা জগৎ মঙ্গলের জন্য দেহধারণ করে থাকতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে অক্ষয়বটের সঙ্গে দিগম্বর বাবার অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। অক্ষয় বটের মূলবীজ দেখা যায় না। কোন কালে কোন উৎস থেকে তার জন্ম তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তেমনি দীর্ঘায়ু ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর বাবার জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাবের দিন, তিথি, নক্ষত্র, ক্ষণ, লগ্ন সবই অজানা রহস্যে আবৃত। তাঁর বাল্যাবস্থা, পিতামাতা, গুরুকরণ, সাধন ভজন—কিছুই জানা যায় না। অক্ষয়বট যেমন বিশাল জটারাশিমণ্ডিত হয়ে উন্নত মস্তকে সকল গাছপালার ওপর মৌন মহীরুহ হয়ে বিরাজ করে, তেমনি দিগম্বর বাবা জটাজুটমণ্ডিত, স্থিতধী, আত্মারাম, মৌনীশান্ত হয়ে সুখাসনে সমাধি মগ্ন হয়ে থাকেন। অক্ষয়বট যেমন অরণ্যমধ্যে বনস্পতিরূপে বিরাজিত, দিগম্বর বাবাও তেমনি সন্ন্যাসী সমাজে বিশাল মহীরুহের মতো বিরাজমান। অক্ষয়বট যেমন অরণ্যের বৃক্ষরাজি, লতাগুল্মরাশি ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি মহাজ্ঞানী দিগম্বর বাবাও সন্ন্যাসী সমাজে সকলের সম্মানীয় ও পরমশ্রদ্ধাভাজন। অক্ষয়বট যেমন ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান, তেমনি দিগম্বর বাবাও উন্নত শির উন্নত গ্রীবা মেরুদণ্ড সোজা করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। অক্ষয়বটের মূল কাণ্ডকে ঘিরে যেমন অসংখ্য ঝুরি নেমে এসে অতন্দ্র প্রহরীর মতো চারদিক থেকে ঘিরে রাখে, তেমনি শিবকল্প দিগম্বর বাবার রজ্জুবৎ অসংখ্য জটারাশি

সর্পের মতো তাঁর সর্বাঙ্গকে বেষ্টন করে থাকে। অক্ষয়বটের ঝুরিগুলো যেমন ওপর থেকে নেমে এসে ভূমিকে স্পর্শ করে, তেমনি বাবার জটারাশিও তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে নেমে এসে কোলের ওপর দিয়ে চরণ স্পর্শ করে ভূমিকে আশীর্বাদ করে। মহাজ্ঞানী দিগম্বর বাবা অক্ষয়বটের মতোই উদার। বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায়, কোটরে কতো কীট পক্ষী প্রাণী আশ্রয়লাভ করে, তার সুশীতল ছায়ায় ক্লান্ত পথিক শীতল হয়, তেমনি মহাকায়, মহাত্মা দিগম্বর বাবাও সর্বদা ব্রহ্মচিন্তনে স্থির থেকে তৃষিত তাপিত পীড়িত সংসারক্লিষ্ট অসংখ্য জীবকে বাৎসল্যপূর্ণ আশীর্বাদ দান করে ধন্য করেন।

আচার্যশঙ্করের অবির্ভাবের বহুকাল পরে সনাতন ধর্মের অন্যতম আলোকস্তম্ভ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের শিখাটি যখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তখন অদ্বৈতবেদান্তী দিগম্বর বাবা আপন সাধনা, তপস্যা ও প্রজ্ঞায় পুনরায় তাকে সংস্কার করে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করার প্রয়াস করেন। প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী তাঁর ভারত পর্যটনের মাধ্যমে তিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম ভাবনার চিন্তাধারাকে দেশময় প্রচার করেছেন। এই মহাপরিব্রাজনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সর্বজীবের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অনুকম্পা। তাঁর মহাবাণীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সনাতনধর্মের সত্য-সুন্দরের প্রতি গভীর আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। নিজে কৃচ্ছ্রসাধনা- সিদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও সংসারী জীবের প্রতি তিনি কখনোই উপেক্ষা প্রদর্শন করেননি। শঙ্করাচার্যের মতো জগৎসংসারকে ব্রহ্মের প্রকাশ বলে মনে করেছেন। সংসারের অসহায় ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবদের প্রতি তিনি অকৃপণ করুণা দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। পরম ব্রহ্মের প্রতি গভীর আস্থাশীল হয়ে তাদের অধ্যাত্মজীবন গঠনে পরামর্শ দিয়েছেন। বহির্মুখী আড়ম্বরপূর্ণ ভক্তিভাবের প্রাবল্যকে দমন করে অন্তর্মুখী সাধন ভজনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মত হল কলিযুগে বেদান্ত সাধনাই একমাত্র আদর্শ পথ। আত্মানুসন্ধানই পরম শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। সততা ও নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। তখনই মুক্তিলাভ হয়। বেদান্ত সাধনাই সেই পথ।

ভারতের অধ্যাত্মজীবনে পৌরাণিক যুগে এবং ঐতিহাসিককালে অনেক আঘাত বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে সনাতন ধর্মের গতি কখনো নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ সনাতন ধর্ম পরমাত্মা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, তাই তা অমর ও অক্ষয়। পরমপুরুষের ইচ্ছানুযায়ী যুগপুরুষগণ আবির্ভূত হয়ে তাকে গ্লানিমুক্ত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দেন। পৌরাণিক যুগের অবতার পুরুষগণ হলেন ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, পরাশর, ব্যাস, শুক প্রমুখ আচার্যগণ। ঐতিহাসিক কালের আচার্যগণ হলেন গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্কর প্রমুখগণ। সেই ধারাতেই শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী মহারাজের আবির্ভাব। সনাতন মানবধর্মের প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। অদ্বৈতসিদ্ধিই পরম প্রাপ্তি। আত্মজ্ঞান লাভই মোক্ষের উপায়। পরমব্রহ্মে প্রতিষ্ঠালাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর স্বরূপে পরমপুরুষ তোতাপুরী মহারাজকে উপলব্ধি করা কঠিন। তাঁর লৌকিক রূপ, ধীর শান্ত ঋষিকল্প ভাব, অনাড়ম্বর সরল জীবনচর্চা, উদার লোকব্যবহার, জীবের প্রতি অকৃপণ স্নেহ আমাদের কাছে স্মরণীয় ও অনুধাবনের বিষয়। বর্তমান কালে সমাজে জনজীবনে যে ধর্মবিদ্বেষ, অশান্তি ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করতে পারে একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত চিন্তার প্রচার। কারণ সকল ধর্মের মূল এই অদ্বৈত ভাবনায় নিহিত। মহাজ্ঞানী দিগম্বর বাবা অদ্বৈত ব্রহ্মবাদকেই প্রচার করেছিলেন। তাই তাঁর উপদেশাবলী, বাণী, আজও আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক এবং তা আগামী প্রজন্মকেও আলো দেখাবে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ শ্রীমৎ তোতাপুরী মহারাজের শ্রীচরণ যুগলে ভক্তিনম্র প্রণাম জানাই।

—শ্রীগুরু জয়—

পরিশিষ্ট : ভাওয়ালরাজ মামলা

ইংরেজ রাজত্বকালে ঢাকা জেলার কাছাকাছি এক বিশাল জমিদারী হল ভাওয়াল রাজ। ঢাকা শহরের উত্তরে জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজের বিশাল প্রাসাদোপম রাজবাড়ী। গত শতকের গোড়ার দিকে এই জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬,৫০,০০০ টাকা। জমিদারী দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন ইংরেজ ম্যানেজার Mr. Needham.

ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র প্রত্যেকে এক তৃতীয়াংশ জমিদারী এস্টেটের উত্তরাধিকারী হলেন। তিন রাজকুমারই ছিলেন বিবাহিত। জমিদার বংশের ধারায় তাঁরা অত্যন্ত বিলাসিতায় জীবন কাটাতেন। মধ্যম কুমারের নাম রমেন্দ্রনায়ারণ রায়চৌধুরী। অত্যন্ত শৌখিন মানুষ। শিকার, দাবাখেলা, লাঠিখেলা, গানবাজনা, নেশার মধ্যে ডুবে থাকতেন। তিনি ভাওয়াল রাজের মামলার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং-এ যান। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী বিভাবতী, শ্যালক সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং কুমারের পারিবারিক ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্ত। আর জনা কুড়ি কাজের লোকজন। কিছুদিন ভালোই কাটল। ৬ই মে রমেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের দিনই মারা গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর। ৮ই মে ভাওয়ালে টেলিগ্রাম পাঠানো হল, কুমার মারা গেছেন। তিন দিন পরে কুমারের বিধবা পত্নী বিভাবতী সকলকে নিয়ে জয়দেবপুরে ফিরে এলেন। পরিবারের লোকেরা রাজকুমারের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মনে করলেও প্রজারা তা মানতে পারল না। মেজ রাজকুমারের মৃত্যুকে ঘিরে এক রহস্যের জাল সৃষ্টি হল। কুমারের মৃত্যুতে প্রজারা বিস্মিত হয়ে পড়ল। নানা কাহিনী ও গুজব ছড়াতে লাগল। রাজকুমারের এক কর্মচারী শরীফ খান ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। তার কথায়, মধ্যম কুমার হঠাৎ বমি করতে শুরু করলে তিনি তাঁকে ধরতে যান এবং কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ তার পোষাকে পড়ে যায়। তাতে অ্যাসিডের মতো কোনো পদার্থ থাকায় পোষাক ফুটো ফুটো হয়ে যায়। তাতে সন্দেহ হয় কুমারকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। আবার এমন কথাও শোনা যায় যে কুমারের দেহ ঠিকমত দাহ করা হয়নি। কারণ শবদেহটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে চিতা জ্বালানো যায়নি। ঝড়বৃষ্টির জন্যে শববাহকরা সকলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে সেখানে ফিরে এসে তারা আর কুমারের দেহ দেখতে পায় নি। যাইহোক, জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে কোনোমতে কুমারের শ্রাদ্ধশান্তি অনুষ্ঠিত হল।

রমেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধতে লাগল। গুজব ছড়াতে লাগল রাণী বিভাবতী তার ভাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তির লোভে কুমারকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি শবদেহ দাহ করে ফেলে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছেন। পাহাড়ি নদীর পাশেই শ্মশান। কাঠের চিতা সাজানো হয়েছিল। চিতা জ্বালানোর সময় হঠাৎ জোরে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। তখন সকলে চিতা ফেলে আশ্রয়ের খোঁজে পালায়। চিতায় আগুন দেওয়া হলেও সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে যায়। প্রবল নদীর জোয়ারে চিতাটি ভেসে যায়। প্রায় তিন মাইল ভেসে যাওয়ার পর কয়েকজন সন্ন্যাসী কাপড়ে জড়ানো দেহটি দেখতে পান। দেহটিতে তখনও প্রাণের স্পন্দন ছিল। সন্ন্যাসীদের গুরু বললেন, লোকটি মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে। চিতা থেকে তুলে ওকে আমাদের আশ্রয়ে নিয়ে চল। কিছুক্ষণ পরেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।

অনেকেই দিগম্বর তোতাপুরী বাবাকেই সেই সন্ন্যাসীদের গুরু বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ঘন্টা দু'য়েক পরে রমেন্দ্রনারায়ণের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু তাঁর স্মৃতি লোপ পেয়ে গেল। তিনি পূর্বকথা কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না। জীবনদাতা নাগা সন্ন্যাসীকে তিনি গুরু বলে মানতেন। তাঁর সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর

তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। পরে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভারত পর্যটনে বার হলেন। সন্ন্যাসী গুরু বলেছিলেন, কুমার পূর্ব স্মৃতি ফিরে পাবে এবং বাড়ী ফিরে যাবে।

বিভাবতী কয়েক মাস জয়দেবপুরে বাস করার পর সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে যান। এরপর ভাওয়াল রাজের আকাশে অন্ধকার নেমে আসে। বড় রাজকুমার রণেন্দ্রনারায়ণ ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মারা গেলেন। ১৯১৩ সালে ছোট রাজকুমারের মৃত্যু হয়। তিন বিধবা রাণীর কারোও কোনো সন্তান ছিল না। ফলে ব্রিটিশ সরকারের জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত আদালত (Court of Wards) ভাওয়ালের জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে বিভাবতী দেবী মৃত স্বামীর নামে জীবন বিমার ৩০,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য রাজস্বের অংশ ৩৫,০০০ টাকা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতার ল্যান্স ডাউন রোডে একটা বাড়ী কেনেন।

এদিকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকে ঘিরে গুজব ছড়াতে থাকে। প্রজারা তাঁর মৃত্যুকে মেনে নেয়নি। তাদের ধারণা হল কোনো এক নাগাসন্ন্যাসী কুমারকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং রমেন্দ্রনারায়ণ এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। দার্জিলিং-এ কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁকে ঘুরতে দেখা গেছে। রমেন্দ্রর বোন জ্যোতির্ময়ী দেবীও বিশ্বাস করতেন তাঁর ভাই জীবিত আছেন।

রমেন্দ্রের মৃতুর প্রায় বারো বছর পরে বাকল্যান্ডে বাঁধের (Buck Land) ওপর এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। যদিও তাঁর শরীর ভস্মমাখা, তবু স্থানীয় লোকেরা তাঁকে মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলে সন্দেহ করতে লাগল। কারণ তারা সন্ন্যাসীর চেহারার সঙ্গে রাজকুমারের দেহের অনেক মিল লক্ষ্য করল। জ্যোতির্ময়ী দেবীও নানা জায়গা থেকে সংবাদ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রমেন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। বাকল্যান্ডে বাঁধের ওপর সন্ন্যাসী প্রায় চারমাস খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকতেন। জ্যোতির্ময়ীদেবীর মতো অনেক শিক্ষিত প্রজারাও বিশ্বাস করতে লাগল রমেন্দ্রনারায়ণ জীবিত আছেন ও সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। তাদের ধারণা দৃঢ়মূল হল যে জটাধারী লম্বা গোঁফদাড়িধারী সাদা কাপড় পড়া সন্ন্যাসীই মধ্যম কুমার রমেন্দ্র। কিন্তু বিভাবতী তাঁকে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন।

জ্যোর্তিময়ীর ভাগনে বুদ্ধুকে পাঠানো হল বাকল্যান্ড বাঁধের সন্ন্যাসীকে ভালো করে দেখে সনাক্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে রমেন্দ্রর কিছু কিছু মিল থাকা অসম্ভব নয় মনে করলেও নিশ্চিত হতে পারলেন না। এরপর স্থানীয় লোকেরা একদিন হাতীর পিঠে চড়িয়ে সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে নিয়ে এলেন। সে দিনটি ছিল ১৯২১ সালের ১২ই এপ্রিল। বিকাল বেলা। সন্ন্যাসী মধ্য বাড়ীতে গিয়ে কামিনী গাছের তলায় বসলেন। এই বাড়ীতেই সাধারণত রাজবাড়ীর সাধুসন্ত ও অতিথিদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হত। তখন রাজবাড়ীতে শুধু অশীতিপর বৃদ্ধা রাণী সত্যভামা একজন নাতনীর সঙ্গে কিছু কর্মচারীদের নিয়ে থাকতেন। সেদিন দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন ও রাজপরিবারের সকল কর্মচারীগণ সন্ন্যাসীকে দেখতে এলেন।

পরের দিন সকালে ভাওয়ালের সেক্রেটারী যোগেন ব্যানার্জী তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখতে এলেন। সন্ন্যাসী বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসে ছিলেন। তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখলেন। পরে তাঁরা তাঁকে মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলে চিনতে পারলেও তখনই কিছু প্রকাশ করতে রাজি হলেন না।

কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধু এসে জানালেন জ্যোতির্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। সন্ন্যাসী যেতে রাজী হলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি বারান্দায় বসলে জ্যোতির্ময়ী ভালো করে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলেন। আর আড় চোখে সকলকে দেখছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্দেহের মাত্রা বাড়ল। কারণ মেজ রাজকুমার ঠিক এইভাবেই অন্যদের দেখতেন। তিনি তাঁর চোখ, কান, ঠোঁট, শরীর, হাত, পা, মুখের আদল খুব ভালো করে দেখছিলেন।

জ্যোতির্ময়ী সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন, কদিন থাকবে? সন্ন্যাসী জানালেন, তিনি পরের দিন লাঙ্গলবাঁধে যাত্রা করবেন ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য। সন্ধ্যার সময় আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তাই পরের দিন সন্ন্যাসীকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো হল। যাতে দিনের আলোয় আরো ভালো করে সব দেখা যায়।

পরের দিন রাজবিলাসে দেখা গেল সন্ন্যাসী হেঁটে বেড়াচ্ছেন। জ্যোতির্ময়ীদেবী ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে মধ্যম কুমারের ঘরের ভেতর লক্ষ্য করছেন। তিনি গৃহসংলগ্ন বাথরুমে গেলেন ও কল খুলে হাত মুখ ধুলেন। দুপুরে জমিদারীরাজের গাড়ীতে চেপে জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গেলেন। একটা চেয়ারে বসলেন। ইন্দুময়ীর স্বামী গোবিন্দ মুখার্জী একটা চৌকিতে বসেছিলেন। সত্যভামা ও জ্যোর্তিময়ী বসেছিলেন চেয়ারে। সন্ন্যাসী উঠে গিয়ে সত্যভামাকে হাত ধরে ভালো করে চৌকিতে বসালেন। পরিবারের অন্যান্যদের পরিচয় জানতে চাইলেন। ইন্দুময়ীর মেয়ে কেনী ছিলেন বিধবা। তাঁর পরিচয় পেয়ে সন্ন্যাসীর কপোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ইন্দুময়ীর ছেলে টেবু সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমারের কিছু ফটো দেখালেন। এবার সন্ন্যাসী কেঁদে ফেললেন। জ্যোতির্ময়ী বললেন, তুমি তো সংসার ত্যাগ করেছ। তবে কাঁদছ কেন? সন্ন্যাসী বললেন—মায়ার জন্য কাঁদছি। রমেন্দ্রর দার্জিলিং-এ গিয়ে মরার প্রসঙ্গ উঠল। জ্যোতির্ময়ী জানালেন কেউ বলে তাকে দাহ করা হয়েছিল। কেউ বলে দাহ করা হয়নি। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সন্ন্যাসী বললেন, না, দাহ করার কথা সত্যি নয়, সে এখনো জীবিত আছে। জ্যোতির্ময়ী এবার সরাসরি সন্ন্যাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মুখের সঙ্গে আমার মেজ ভাই-এর অদ্ভুত মিল রয়েছে। তা হলে তুমিই কি রমেন্দ্র?' সন্ন্যাসী বললেন, 'না, আমি তোমাদের কেউ নই, তবে তিনি জ্যোতির্ময়ীর বাড়ীতে আহার করলেন। জ্যোতির্ময়ী সন্ন্যাসীর খাওয়ার ধরণ, তাঁর কণ্ঠনালীর ওঠানামা, চোখ সবই মধ্যম কুমারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখলেন। এমনকি সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরও মেজ কুমারের মতো। জ্যোতির্ময়ীর সন্দেহ প্রবল হল। মেজকুমারই সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছে তাতে কোনো সংশয় নেই।

এরপর সপ্তাখানেক সন্ন্যাসীর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তারপর একদিন আবার তাঁকে বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর দেখা গেল। বুদ্ধু তাঁকে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সেখানে জ্যোতির্ময়ীর ছোটবোন তরিন্ময়ীকে সন্ন্যাসীকে দেখতে বললেন।

৩০শে এপ্রিল পুনরায় সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে জ্যোতির্ময়ীর বাড়ীতে আনা হয়। সেখানে আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীগণ ও আরোও অনেক শিক্ষিত মানুষ জড়ো হল। জ্যোতির্ময়ী সন্ন্যাসীকে স্নানের পর গায়ে ভস্ম মাখতে নিষেধ করলেন। প্রথম দু'দিন সন্ন্যাসী তাঁর কথা না শুনলেও তৃতীয় দিন গায়ে ভস্ম মাখলেন না। জ্যোতির্ময়ী বললেন, তাঁর গায়ের রঙ ঠিক মধ্যম কুমারের মতো। বরং এতকাল ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে আরোও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তাঁর মুখের আদলও রমেন্দ্রর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাঁর শরীরে একটা গাড়ীর চাকার ক্ষতচিহ্ন ছিল, সন্ন্যাসীর শরীরেও সেটা দেখা গেল। গোড়ালি থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত ওপরের অংশ সবই রমেন্দ্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এবার আত্মীয়রা সকলেই একমত হলেন, এই সন্ন্যাসীই মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪ঠা মে আরোও একবার ভালো করে পরীক্ষা করার জন্য জ্যোতির্ময়ী বুদ্ধুকে বললেন। একটু বেলার দিকে অসংখ্য মানুষ সন্ন্যাসীকে দেখতে এল। বাইরেও অনেক মানুষ অপেক্ষা করছিল। জ্যোতির্ময়ী বললেন, তোমার চেহারা, লক্ষণ ও সবচিহ্ন আমার মেজভাই-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চই রমেন্দ্রনারায়ণ। তোমার আত্মপরিচয় দাও।

—না আমি তোমাদের কেউ না, আমায় বিরক্ত কোর না।

—তোমাকে অবশ্যই আত্মপরিচয় দিতে হবে। জ্যোতির্ময়ী জোরের সঙ্গে বললেন। সেখানে সমস্ত আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ২০০০ জনতা হাজির ছিল। জ্যোতির্ময়ী সন্ন্যাসীকে বললেন, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। তুমিই মধ্যম কুমার রমেন্দ্র। তুমি যতক্ষণ না আত্মপরিচয় দাও, ততক্ষণ আমি কিছুই খাবো না।

তখন জনতার মধ্য থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করল—আপনার নাম কি?

—রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

—আপনার পিতার নাম কি?

—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

—আপনার মাতার নাম?

—রাণী বিলাসমতী দেবী।

কেউ একজন বলে উঠল, কিন্তু রাজা রাণীর নাম তো সকলেই জানে। বলুন আপনার নার্সের নাম কি?

—অলকা।

এবার জনতা আনন্দে উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল। 'জয় মধ্যম কুমারের জয়' বলে জয়ধ্বনি করে উঠল। মেয়েরা জোরে উলুধ্বনি দিল। তখন সন্ন্যাসী যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্যোতির্ময়ী ও বাড়ীর মহিলারা সামনে এসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। কেউ বা চোখেমুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসীকে ছোট বোন তরিন্ময়ীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল।

পরের দিন ভাওয়ালরাজের ম্যানেজার Mr. Needham ঢাকার কালেক্টর ও ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে সব তথ্য জানিয়ে এক গোপন চিঠি পাঠালেন। চিঠির কপি কলকাতায় রাণী বিভাবতী ও অন্য রাণীদের পাঠানো হল।

এদিকে জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়ীতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সন্ন্যাসী রাজকুমারকে দেখতে আসতে লাগল। সন্ন্যাসী নিজেকে রমেন্দ্রনারায়ণ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি এখন সন্ন্যাসীর পোষাক ত্যাগ করে সাধারণ পোষাক পরছেন। কিন্তু চুল ও দাড়ি ঠিক রয়েছে। প্রতিদিন চেয়ারে বসে জনতাকে দর্শন দেন। তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন। পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে চোখের জল ফেলেন। তিনি বলেন দার্জিলিং-এ গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপরের কথা আর কিছু মনে নেই। পরে যখন জ্ঞান ফেরে দেখেন এক নাগা সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে আছেন। তিনি তাঁকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁকেই তিনি গুরু বলে মানেন। এতদিন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছেন। এরপর তাঁর পূর্ব স্মৃতি ফিরে আসে। তিনি গুরুর আদেশে বাড়ী ফিরে আসেন।

পুলিশ রিপোর্টে সব তথ্য প্রকাশ হতে লাগল। ১৫ই মে তারিখে জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে এক জনসভা ডাকা হল। ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সকাল থেকেই প্রচুর মানুষ জমা হতে লাগল। প্রায় ১০,০০০ লোকের সমাবেশ হল। ভাওয়ালের নাম করা তালুকদার আদিনাথ চক্রবর্তী সভাপতি হলেন। তিনি প্রথমে পটভূমির বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এবং সন্ন্যাসীর আত্মপরিচয় দানের কথা বললেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলে সকলেই একমত হয়েছেন যে, তিনিই মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী আত্মীয় অবশ্য তাঁর পরিচয় স্বীকার করেন না। তালুকদারগণ সকলে এবং ভাওয়ালের প্রজারাও মেনে নিয়েছেন যে তাদের প্রিয় রমেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন। এই মর্মে এক Resolution করা হল যে, সকলেই ঐক্যমত হয়েছেন যে, মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন। এই Resolution এর কপি গভর্নর, বোর্ড অব রেভিনিউ, ডিভিশনাল কমিশনার এবং জেলাশাসকের কাছে পাঠানো হল। সকলে মধ্যম রাজকুমারের নামে জয়ধ্বনি করতে লাগল। এই সময় কালবৈশাখী ঝড় উঠল। ঝড় জলে সভার কাজ শেষ হল।

কয়েকদিন পর মধ্যম কুমারের জমিদারী সত্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হল। 'ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজা সমিতি' নামে একটা সমিতি গঠন করা হল। ভাওয়ালের তালুকদারদের অন্যতম দিগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তার সভাপতি হলেন। ২৯শে মে তারিখে সন্ন্যাসী নিজেকে রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী পরিচয় দিয়ে একজন স্থানীয় জমিদার ও দু'জন উকিলকে নিয়ে কালেকটর H. J. Lindsey র বাড়ীতে গেলেন। কালেকটর সাহেব তাঁর দাবী নথিভুক্ত করলেন।

কিন্তু উপনিবেশিক ইংরেজ সরকার এবং 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' মামলা নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করল না। ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজমেন্ট দাবীদারের পক্ষে তাঁর পরিচয় জানার জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলেন। দু'জন পর্যবেক্ষককে পাঞ্জাবে পাঠানো হল। রাজস্ববিভাগীয় বোর্ড ৩রা জুন ঘোষণা করলেন যে, মধ্যম কুমারের দেহ দার্জিলিং-এ দাহ করা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুতরাং বর্তমান দাবীদার একজন প্রতারক।

তৎসত্ত্বেও ভাওয়াল রাজের প্রজারা সন্ন্যাসীকে সমর্থন করতে থাকে এবং খাজনা দিতে থাকে। দাবীদারের পক্ষে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ আনন্দচন্দ্র রায় সওয়াল করতে রাজী হন। সৌরেণ মুখার্জীও দাবীদারের সমর্থক ছিলেন।

উভয়পক্ষই নিজ নিজ সমর্থনে প্রচুর বিজ্ঞপ্তি ও Hand Bill প্রচার করতে থাকে। তাতে কুমারের মৃত্যু রহস্য, বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র, দাহকরা নিয়ে হটকারিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে কাহিনী লেখা হতে থাকে।

এরপর দাবীদার ১৯২৪ সালে কলকাতায় আসেন। সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে Bengal Land Lords Association এর সদস্য হন। তিনি ৫ বছর ধরে নানা সূত্রে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠার সমর্থন লাভ করেন। তারপর ঢাকায় ফিরে যান। ঢাকায় তাঁর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ারের খাজনা আদায় করতে থাকেন।

স্বাভাবিকভাবে যখন কিছুই মিটল না তখন রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে আইনজীবীরা ঢাকা কোর্টে এক মামলা দায়ের করলেন। বিভাবতী দেবী এবং অন্য জমিদার যাঁরা Court of Wards কে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা বিবাদী পক্ষ হলেন। ডিসট্রিক জজ (District Judge) মামলাটি বিচারপতি পান্নালাল বোসের এজলাসে তোলার আদেশ দেন। বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী দাবীদারের পক্ষে সওয়াল করেন এবং বিপক্ষে সওয়াল করেন অমিয়নাথ চৌধুরী। ১৯৩৩ সালে নভেম্বর মাসে শুনানি শুরু হয়। তিন বছর ধরে শুনানি চলে। রমেন্দ্রনারায়ণ কোর্টে তাঁর জবানীতে বলেন, তিনি তাঁর আত্মীয় (শ্যালক) সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানহীনা ভগ্নীর সম্পত্তির অধিকার নিতে চান। সেই কারণে ডাক্তার দাশগুপ্তকে দিয়ে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগে তাঁকে মারার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা তড়িঘড়ি তাঁর দেহ দাহ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিলাবৃষ্টির জন্য তা সফল হয়নি। এক নাগা সন্ন্যাসী তাঁকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁদের আশ্রয়ে নিয়ে যান এবং তিনি প্রাণ ফিরিয়ে দেন। প্রাণ ফিরে পেলেও তাঁর অতীত স্মৃতি সবই লোপ পায়। এরপর ১৯০৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত প্রায় বারো বছর সন্ন্যাসী হয়ে সাধুদের সঙ্গে নানা জায়গায় পর্যটন করতে থাকেন। চিটাগাঙ থেকে ঢাকায় ফেরার পথে তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে। তাঁর ভাওয়ালের সম্পত্তিলাভের কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আত্মপরিচয় দিতে এবং কোর্টে মামলা করতে বাধ্য হন।

অবশেষে বিচারপতি পান্নালাল বোস ১৯৩৬ সালের ২৪শে আগস্ট দীর্ঘ বিবরণের পর দাবীদারের পক্ষে রায় দিলেন। রমেন্দ্র নারায়ণ এস্টেটে ফিরে Board of Revenue র কাছে রাজস্বের দাবী পেশ করলেন। Court of Wards টাকা দিল না। ওই বছর অক্টোবর মাসে সরকার পক্ষ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অর্ডার দিলেন যে, আগের শুনানির সব বয়ান আপীল আদালতে পেশ করতে হবে। তিন জন বিচারপতি Sir Leonard Costello, চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং Ronald Francis Lodge কে নিয়ে একটা স্পেশাল বেঞ্চ গঠিত হয়। উভয় পক্ষই নিজেদের উকিল বহাল রাখেন। শুনানি শুরু হয় ১৯৩৮ সালের ১৪ই নভেম্বর এবং শুনানি শেষ হয় ১৯৩৯ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিচারপতি Mr. Costello বিলেতে চলে যান। নভেম্বর মাসে তাঁর ফেরার কথা কিন্তু যুদ্ধের জন্য ফিরতে পারলেন না। তখন বাকী দুই বিচার পতি সিদ্ধান্ত করলেন যে রায়দানে আর দেরী করা চলে না। তাঁরা লিখিতভাবে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত Mr. Costello কে জানালেন। তিনিও বিলেত থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানালেন।

বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি পান্নালাল বোসের দীর্ঘ রায় থেকে সিদ্ধান্ত করে জানালেন যে বিবাদীপক্ষ রমেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু প্রমাণ করতে পারেননি। তিনি বিবাদীপক্ষকে আদালতে মিথ্যা প্রমাণপত্র দাখিল করার দায়ে অভিযুক্ত করলেন এবং বাদী পক্ষের সমর্থনে রায় দিলেন। বিচারপতি Mr. Lodge বিবাদী পক্ষের সমর্থনে রায় দিলেন।

১৯৪০ সালে ২৯শে আগষ্ট বিচারপতি Costello 'Court of Wards' এর সমালোচনা করে নিম্ন আদালতের রায়কে সমর্থন জানালেন। তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সরকার পক্ষের আপীল বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। এবারও রমেন্দ্রনারায়ণ জিতে গেলেন। তিনি তাঁর জমিদারীর অংশ থেকে টাকা তোলার অনুমতি পেলেন।

কিন্তু বিভাবতীদেবী সহজে হার স্বীকার করতে রাজী হলেন না। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য আর আপীল করা গেল না। তারপর বিভাবতীদেবীর আইনজ্ঞগণ হাইকোর্টের বিরুদ্ধে London Privy Council এ আপীল করলেন।

১৯৪৫ সালে মামলার শুনানি শুরু হয়। ২৮ দিন ধরে শুনানি চলে। তিনজন বিচারপতি ১৯৪৬ সালের ৩০ শে জুলাই আপীল বাতিল করা হল বলে ঘোষণা করলেন। এবারও রায় রমেন্দ্র নারায়ণের পক্ষে গেল। পরের দিন টেলিগ্রাফে রায় জানানো হল।

সেই দিন মামলা জিতে রমেন্দ্রনারায়ণ কালী মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন।

—

গ্রন্থঋণ

১. ওঁ অধ্যাত্ম বিদ্যা স্বামী মহাদেবানন্দ
২. অদ্বৈত সিদ্ধিঃ ১ম, (১৩৩১) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩. অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়
৪. পঞ্চদশী প্রদীপ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী
৫. বেদান্তবিদ্ গুরু ঐ
৬. উপনিষদ কালিকানন্দ অবধূত
৭. শ্রীমদ্ভাগবতগীতা সুরোধূণী দেবী
৮. শ্রীশ্রীচণ্ডী
৯. শ্রীশ্রীগুরুগীতা
১০. উৎকল খণ্ডম্ পুরাতন
১১. শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা গৌতম বিশ্বাস
১২. History and Culture of Orissa M. N. Das
১৩. শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ২য়, ৩য় ভাগ স্বামী সারদানন্দ
১৪. The Life of Ramkrishna Romain Rolland
১৫. Sree Sree Digambar Baba Monika Mitra
১৬. ভারতের সাধক, ৫ম খণ্ড শঙ্করনাথ রায়
১৭. Sri Totapuriji Maharaj Girnaribant Puri
১৮. PURI : Heritage of an Ancient Land Somnath Khuntia
১৯. Living with Great Himalayan Masters Rama Swamy